অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুড়ো



আংলা

বুড়ো আংলা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুড়ো আংলা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হিন্দুত্ববুক্স

https://hindutvabooks.com

https://facebook.com/hindupustakkendra

https://twitter.com/hindutvabooks

mailto:hindutvabooks@gmail.com

আমতলি



রিদয় বলে ছেলেটা নামেই হৃদয়, দয়ামায়া একটুও ছিল না। পাখির বাসায় ইঁদুর, গরুর গোয়ালে বোলতা, ইঁদুরের গর্তে জল, বোলতার বাসায় ছুঁচোবাজি, কাকের ছানা ধরে তার নাকে তার দিয়ে নথ পরিয়ে দেওয়া, কুকুর-ছানা বেরাল-ছানার ল্যাজে কাঁকড়া ধরিয়ে দেওয়া, ঘুমন্ত গুরুমহাশয়ের টিকিতে বিচুটি লাগিয়ে আসা, বাবার চাদরে চোরকাঁটা বিঁধিয়ে রাখা, মায়ের ভাঁড়ার-ঘরে আমসির হাঁড়িতে আরশোলা ভরে দেওয়া— এমনি নানা উৎপাতে সে মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, সবাইকে এমন জ্বালাতন করেছিল যে কেউ তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না।

রিদয়ের মা-বাপ ছিল আমতলি গাঁয়ের প্রজা। দুজনেই বুড়ো হয়েছে। রিদয় তাদের এক ছেলে, বয়স হল প্রায় বারো বছর; অথচ ছেলেটা না শিখলে লেখাপড়া, না শিখলে চাষবাসের কাজ; কেবল নষ্টামি করেই বেড়াতে লাগল। শেষে এমন হল যে তার বাপ-মা বাইরে হাটে-মাঠে যাবার সময় রিদয়কে ঘরে তালা বন্ধ কয়েদ করে রেখে যেত।

তখন শীত গিয়ে গরম পড়তে আরম্ভ হয়েছে। গাছে-গাছে আমের বোল আর কাঁচা-আমের গুটি ধরেছে, পানাপুকুরের চারধার আমরুলীশাকের সবুজ পাতায় ছেয়ে গিয়েছে; আলের ধারে-ধারে নতুন দুর্বো, আকন্দফুল সবে দেখা দিয়েছে; দূরে শাল-পিয়ালের তেঁতুল-তমালের বনে নতুন পাতা লেগেছে, আর দেখতে-দেখতে সমস্ত বন যেন পুরন্ত বাড়ন্ত হয়ে উঠছে; রোদ পাতায়-পাতায় কাঁচা-সোনার রঙ ধরিয়ে দিয়েছে; কুয়াশা আর মেঘ সরে গিয়ে মনে হচ্ছে যেন নীল আকাশের কপাট হঠাৎ খুলে গেছে আর আলো আর বাতাস ছুটে বেরিয়ে এসেছে—বাইরে! রিদয়ের কুলুপ-দেওয়া ঘরেও আজ দরমার ঝাঁপগুলোর ফাঁক দিয়ে রোদ উঁকি দিচ্ছে, বাতাস সরু সুরে বাঁশি দিয়ে ঢুকছে। রিদয় কিন্তু এসব

দেখছে না, শুনছেও না। সে চুপটি করে নষ্টামির ফন্দি আঁটছে। কিন্তু গর্ত ফেলে ইঁদুর যে আজ নতুন বসন্তে শুকনো পাতায় ছাওয়া বাদামতলায় রোদ পোহাতে বেরিয়ে গেছে, বেরাল-ছানাটা কাঁঠালতলায় কাঠবেরালির সঙ্গে ভাব করতে দৌড়েছে, গোয়াল ঘরের কপ্‌লে গাই তার নেয়াল বাছুরটাকে নিয়ে ল্যাজ তুলে ঢেঁকির মতো লাফাতে-লাফাতে মাঠের দিকে দৌড় দিলে, ঘুলঘুলি দিয়ে সেটা হৃদয় স্পষ্ট দেখলে।

ঘুলঘুলিটার বাইরে একটা ডালিম গাছ। ডালিমের উপরে ময়ূরের মতো রঙ একটা ছোট কি পাখি এসে শিস দিতে লাগল—রিদয়ের নাগালের ঠিক বাইরেটিতে বসে—"ও হিরিদয়! ও হিরিদয়!" রিদয় ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে কাঁধ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েও মাঝের আঙুলের ডগাটি দিয়ে ডালিমটিতে ছোঁয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারলে না। পাখি ডালিমের আর এক ডালে সরে বসে এমন খিট্‌খিট্ খিট্‌খিট্ করে হেসে উঠল যে রিদয় একেবারে লজ্জায় মাটি!

সে পাখিটাকে ছুঁড়ে মারবার জন্য একটা কিছু খুঁজতে চারদিকে চাইছে, এমন সময় ঘরের কোণে মস্ত দুটো মরচে-পড়া তালা-আঁটা সুঁদ্‌রি কাঠের উপরে পিতলের পাৎ আর পেরেকের নক্সা-কাটা বহুকালের সিন্দুকটার দিকে তার নজর পড়ল। যে কুলুঙ্গিতে ইঁদুরে-চড়া লাল-মাটির গণেশ ছোট ঢোলক বাজাচ্ছেন, ঠিক তারি নিচে, ঘরের একদিকের দেয়াল জুড়ে সিন্দুকটা রয়েছে। এতবড় যে মনে হচ্ছে যেন একটা রত্নবেদী!

এই সিন্দুকে কি যে আছে, তা রিদয় এ পর্যন্ত দেখেনি; কিন্তু সে জানে তার ঠাকুরদাদা, তার দাদা, তার দাদা, তার আবার দাদার দাদা—এমনি কত পুরুষের বাসন, গয়না আর যা-কিছু ভালো দামী আশ্চর্য সামগ্রী এই সিন্দুকটায় জমা আছে। লক্ষ্মীপুজোর দিন রিদয়ের মা এই সিন্দুককে সিঁদুরের ফোঁটা, ধানের শীষ দিয়ে সাজিয়ে পুজো করে, ঢিপঢিপ প্রণাম করে কতবার রিদয়কে বলেছেন—"দেখিস, সিন্দুকে পা ঠেকাসনে, ওতে লক্ষ্মী আছেন।"

সিন্দুকটা রিদয়ের বাপ-মা এক-একদিন ভাদ্দর মাসে ঠেলাঠেলি করে খুলে, তার থেকে ভারি-ভারি রূপোর গয়না, বেনারসী শাড়ি, কাঁসার বাসন বার করে, ঝেড়ে-পুঁছে যেখানকার যা গুছিয়ে রাখতেন; কিন্তু সিন্দুকের মধ্যেটায় যে কি, রিদয় এ পর্যন্ত একদিনও দেখতে পেলে না। সে দু'পায়ের বুড়ো-আঙুলে ভর দিয়ে খুব চেষ্টা করে মরচে-ধরা তালা দুটোর ফুটোয় চোখ দিতে পারত; তার উপর তার মাথা উঠত না। তালার ফুটোর মধ্যে অন্ধকারে একটা-কি চকচক করছে দেখা যায়, কিন্তু সেটাকে আঙুল দিয়ে টেনে বার করবার অনেক চেষ্টা করেও রিদয় পেরে ওঠেনি। তালা-দুটোকে যদি ভেঙে ফেলা যেত, তবে তালার মধ্যের জিনিস, সেই সঙ্গে সিন্দুকের মধ্যেটাও সে দেখে নিতে পারত। তালাটা কি করে ভাঙা যায় ভাবতে-ভাবতে রিদয়ের হাই উঠতে লাগল, আর চোখও ঢুলে এল।

সেই সময় কুলুঙ্গি থেকে গণেশের ইঁদুরটা জ্যান্ত হয়ে ঝুপ করে সিন্দুকের ডালায় লাফিয়ে পড়ে ল্যাজ উঠিয়ে ছুটোছুটি আরম্ভ করলে। রিদয় পষ্ট দেখতে পেলে গনেশ মোটা-পেটটি নিয়ে শুঁড় দোলাতে-দোলাতে সিংহাসন থেকে নেমে কুলুঙ্গির ধারে পা-ঝুলিয়ে বসে ঢোল বাজাতে লাগলেন আর ইঁদুরটা তালে-তালে ল্যাজ নেড়ে গলার ঘুঙুরের ঝুমঝুম শব্দ করে-করে নাচতে থাকল।

রিদয় ইঁদুর অনেক দেখেছে, গণেশের গল্পও অনেক শুনেছে, কিন্তু জ্যান্ত গণেশ সে কখনো দেখেনি! এই বুড়ো-আঙুল যতটুকু, গণেশটি ঠিক ততটুকু! পেটটি বিলিতি-বেগুনের মতো রাঙা চিকিচিকে, মাথাটি শাদা, শুঁড়টি ছোট-একটা কেঁচোর মতো পেটের উপর গুটিয়ে রয়েছে; কানদুটি যেন ছোট দুখানি কুলো, তাতে সোনার মাকড়ি দুলছে; গলায় একগাছি রূপোর তারের পৈতে ঝোলানো; পরনে লাল-পেড়ে পাঁচ-আঙুল একটি হলদে ধুতি, গলায় তার চেয়ে ছোট একখানি কোঁচানো চাদর; মোটা-সোটা এতটুকু দুটি পায়ে আংটির মতো ছোট-ছোট ঘুঙুর, গোল-গাল চারটি হাতে বালা, বাজু, তাড়; গলা থেকে লাল সুতোয় বাঁধা ছিটমোড়া ছোট্টো ঢোলকটি ঝুলছে। কথকঠাকুর সম্‌স্কৃতে গণেশ-বন্দনা করতেন:

গণেশায় নমঃ নমঃ আদিব্রহ্ম নিরুপম পরম পরাৎপর।

খর্ব্ব-স্থূলকলেবর গজমুখ লম্বোদর মহাযোগী পরমসুন্দর॥

হেলে শুণ্ড বাড়াইয়া সংসার সমুদ্র পিয়া খেলাছলে করহ প্রলয়।

ফুৎকারে করিয়া বৃষ্টি পুনঃ কর বিশ্বসৃষ্টি ভালো খেলা খেল দয়াময়॥

এই বন্দনা শুনে সে গনেশকে মনে করেছিল না-জানি কতই বড়! একেবারে পদভরে মেদিনী কম্পমানা! মেঘ গর্জনের মতো ঢোল বাজিয়ে—তালগাছের গুঁড়ির মতো মোটা শুঁড় দোলাতে-দোলাতে, কানের বাতাসে ঝড় বইয়ে গণেশ নেচে বেড়াচ্ছেন! আসলে গনেশ যে গণেশদাদা পেটটি নাদা, গলায় একটি ঢোলক বাঁধা—পিটুলির পুতুলটির মতো একেবারে ছোট, ঢোলকটি মাদুলীর চেয়ে বড় নয়, আর তিনি নিজে তাঁর ইঁদুরটির চেয়ে একটু ছোট, এটা রিদয় এই প্রথম দেখলে।

রিদয়ের এক-খাঁচা বিলিতি-ইঁদুর ছিল। না খেতে পেয়ে সেগুলো মরেছে! এখন গণেশের সঙ্গে ইঁদুরটিকে ধরবার ফন্দি সে মনে-মনে আঁটতে লাগল। ঘরের মধ্যে নানা জিনিস ছিল, কোনটা গনেশ-ধরার কাজে লাগে, তাই রিদয় দেখতে লাগল। তার এমন সাহস ছিল না যে গনেশকে গিয়ে চেপে ধরে—যদি দাঁত ফুটিয়ে দেয়! বাটনা-বাটা নোড়াটা হাতের কাছে পড়েছিল কিন্তু সেটা ছুঁড়ে মারলে গণেশ এত ছোট যে চেপ্টে যাবার ভয় আছে; পিতলের বোকনোটা চাপা দেওয়া যায় কিন্তু গণেশকে তা থেকে বার করে খাঁচায় পোরা মুশকিল; আটাকাঠিটা পেলে ঠিক হত কিন্তু রিদয়ের বাবা সেটা চালের মটকায় তুলে রেখেছেন; লক্ষ্মীর ঝাঁপিটা কাজে লাগতে পারে কিন্তু গণেশ তো তার মধ্যে ইচ্ছে করে না সেঁধোলে জোর করে ঢোকানো যায় না! চারদিক দেখতে-দেখতে কোণে ঠেসানো চিংড়ি-মাছ-ধরা কুঁড়োজালিটার দিকে রিদয়ের চোখ পড়ল।

তখন গণেশ সিন্দুকের উপরে নেমে, উপরের দুহাতে তুড়ি দিয়ে, নিচের দু'হাতে ঢোলে চাঁটি মেরে, ইঁদুরের সঙ্গে-সঙ্গে ঢোল বাজিয়ে নৃত্য করছেন। রিদয় সাঁ-করে কুঁড়োজালি যেমন চাপা দেওয়া অমনি গণেশ তার মধ্যে আটকা পড়ে যাওয়া!

ইঁদুরটা টপ করে লাফিয়ে কুলুঙ্গির উপরে একেবারে সিংহাসনের তলায় যেমন ঢুকেছে, অমনি মাটির সিংহাসন দুম করে উল্টে চুরমার হয়ে গেল। ইঁদুর ভয় পেয়ে ল্যাজ তুলে কোথায় যে দৌড় দিলে তার ঠিক নেই!

গণেশ জালের মধ্যে মাথা নিচু করে দু-পা আকাশে ছুঁড়তে লাগলেন আর বলতে থাকলেন — "ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বলছি!" কিন্তু দাঁতে-শুঁড়ে-ঢোলকে-জালে এমনি জড়িয়ে গেছেন যে গণেশের নড়বার সাধ্যি নেই। তালের নুটির মতো জালের মধ্যে আটকা পড়ে গণেশ হাঁপাতে-হাঁপাতে মা-দুর্গাকে স্মরণ করতে লাগলেন; সেই সময় ইঁদুর অন্ধকারে আস্তে-আস্তে এসে কটাস-করে রিদয়ের পায়ে এমনি দাঁত বসিয়ে দিলে যে যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে লাগল।

রিদয় জাল ফেলে পায়ে হাত বুলোচ্ছে, এমন সময় গণেশ শুঁড়ে-দাঁতে জাল কেটে বেরিয়ে নিজমূর্তি ধরলেন :

মার-মার ঘের-ঘার হান-হান হাঁকিছে,

হুপ-হাপ দুপ-দাপ আশ-পাশ ঝাঁকিছে!

অট্ট-অট্ট ঘট্ট-ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে,

হুম-হাম খুম-খাম ভীম শব্দ ভাষিছে!

উর্ধ্ববাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য পাড়িছে,

লম্ফ-ঝম্ফ ভূমিকম্প নাগ-দন্ত লাড়িছে!

পাদ-ঘায় ঠায়-ঠায় জোড়া লাথি ছুটিছে,

খণ্ড-খণ্ড লণ্ড-ভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ উঠিছে!

হুল-থুল কুল-কুল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে,

ভস্মশেষ হৈল দেশ রেণু-রেণু উড়িছে!

দেখতে-দেখতে চালে গিয়ে গণেশের মাথা ঠেকল। তিনি দাঁত কড়-মড় করে বললেন— "এতবড় আস্পর্ধা! — ব্রাহ্মণ আমি, আমার গায়ে চিংড়ি-মাছের জাল ছোঁয়ানো! যেমন ছোটলোক তুই, তেমনি ছোট বুড়ো-আংলা যক্ হয়ে থাক!" বলেই গণেশ শুঁড়ের ঝাপটায় রিদয়কে সাত-হাত দূরে ঠেলে ফেলে ভুস করে চণ্ডীমণ্ডপের চাল ফুঁড়ে অন্তর্ধান হলেন।

রিদয় একদিকের দেয়ালে মাথা ঠুকে ঘুরে পড়ল আর দেখতে-দেখতে তার কপাল ফুলে বেল হল। সে বিষম ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে উঠে দেখলে—কেউ কোথাও নেই, মেঝেতে ভাঙা-গণেশের একরাশ রাঙা-মাটি ছড়ানো রয়েছে! গণেশ ভেঙেছে দেখলে বাবা আর তাকে আস্ত রাখবেন না ভেবে রিদয় মাটিগুলো কুড়িয়ে সিন্দুকের পাশে লুকিয়ে রাখতে গিয়ে দেখে সিন্দুকটা এত বড় হয়ে গেছে আর সে এত ছোট হয়ে গেছে যে অনায়াসে সিন্দুকের তলায় সে গলে গেল! মাথার উপর কড়িকাঠের মতো সিন্দুকের তলাকার তক্তাগুলো, তার থেকে আরশোলা ঝুলছে। একটা আরশোলা শুঁড় উঁচিয়ে তাকে তেড়ে এল। রিদয় ভাবছে তখনো সে বড়ই আছে; যেমন আরশোলাকে মারতে যাবে, অমনি সেটা উড়ে এসে এক ডানার ঝাপটায় তাকে উল্টে ফেলে বললে—"ফের চালাকি করবি তো কামড়ে দেব! এখন তুই ছোট হয়ে গেছিস মনে নেই? আগের মতো আর বাহাদুরি চলবে না বলছি!"

রিদয় ভয়ে তাড়াতাড়ি সিন্দুকের তলা থেকে বেরিয়ে নিজের তক্তায় উঠতে গিয়ে দেখে তক্তার খুরোটা তার মাথার থেকে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। তখন রিদয় বুঝলে গণেশের শাপে সে বুড়ো-আঙুলের মতো ভয়ানক ছোট হয়ে একেবারে বুড়ো-আংলা হয়ে পড়েছে। রিদয় প্রথমটা ভাবলে সে স্বপন দেখছে, কিন্তু তিন-চার বার চোখ বুজে, খুলে, নিজের গায়ে চিমটি কেটে যখন সে বুঝলে সব সত্যি—একটুও স্বপ্ন নয়, তখন রিদয় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে ভাবতে লাগল—কি করা যায় এখন?

গণেশ তো শাপ দিয়ে গেলেন—যক্ হয়ে থাক! কিন্তু যক্ বলে কাকে? এই বুড়ো আঙুলটির মতো ছোট থাকা? না, আর-কিছু ভয়ানক হবে?

অন্য ছেলে হলে ভয়ে-ভাবনায় একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকত, কিন্তু রিদয় ছিল নির্ভয়। সে যক্ কাকে বলে কারো কাছে জানবার জন্যে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল।

ছোট হবার সঙ্গে রিদয়ের দুষ্টুবুদ্ধিও ছোট হয়ে গেছে, কাজেই সে মাটিতে মাথা ঠুকে গণেশকে মনে-মনে প্রণাম করতে লাগল আর বলতে থাকল—"ঠাকুর, এবারকার মতো মাফ কর। আর আমি এমন কাজ করব না। ঘাট হয়েছে। যক্ কাকে বলে বলে দাও।" কিন্তু গণেশ কোনো সাড়া-শব্দ দিলেন না।

গণেশের ইঁদুর রিদয়ের উপর ভারি চটেছিল, এতক্ষণ তার ভয়ে সে মটকা থেকে নামতে পারেনি, রিদয় ছোট আর ভালোমানুষ হয়ে গেছে দেখে সে গোঁফ-ফুলিয়ে কাছে এসে বললে—"কেমন! যেমন কর্ম তেমনি ফল! এখন থাকগে পাতালে যক্ হয়ে অন্ধকারে বসে! আর আলোতেও আসতে পাবে না, বাপ-মাকেও দেখা হবে না।"

বাপ-মায়ের উপর রিদয়ের বড়-একটা টান ছিল না, কিন্তু পাতালে চুপটি করে থাকা কিছুতেই সে পারবে না। সে ইঁদুরকে শুধোলে—"ভাই, যক্ কি রকম?"

ইঁদুর উত্তর করলে—"সেকালে লোকে ছেলে-পিলে না হলে বুড়ো হয়ে মরবার সময় যক্ বসাত—জোঁক বসানো নয়, যক্ বসানো! আগে সব বাড়িতে একটা করে চোর-কুটরী ছিল, ডাকাত পড়লে সেই ঘরে মেয়ে-ছেলেদের নিয়ে গেরস্তরা গিয়ে লুকিয়ে থাকত। এই চোর-কুটরীর নিচে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে পাতালের মধ্যে একটা কুয়োর মতো অন্ধকার জায়গায় লোক কখনো-কখনো যক্ বসাত। ছেলেধরা দিয়ে খুঁজে খুঁজে তোমার মতো নিডর দুষ্টু ছেলে তারা ধরে এনে, তাকে ভালো কাপড়, সিঁদুরের টিপ দিয়ে বলির পাঁঠা যেমন করে সাজায় তেমনি করে সেই অন্ধকার পাতাল-পুরীতে এক থালা খাবার,

এক ভাঁড় জল দিয়ে, নিজে না-খেয়ে, দানধ্যান না করে যে-সব ধন-দৌলত জমা করেছে তারই কাছে বসিয়ে দিয়ে, একটি পিদিম জ্বালিয়ে তারই নিচে একটা গোখরো সাপের হাঁড়ি রেখে বলত—'এই যকের ধন তুমি আগলে থাক। যে এখানে ঢুকবে, তাকে যেন সাপে খায়।' হ্রিং টিং ফট এই মন্তর বলে বুড়ো গর্তের মুখে একটা মস্ত পাথর চাপা দিয়ে বেরিয়ে আসত।"

রিদয় বিষম ভয় পেয়ে বলে উঠল—"তারপর?"

"তারপর আর কি? দু'চার দিনে থালার খাবার, ভাঁড়ের জল ফুরিয়ে গেলে ছেলেটা রোগা হয়ে শুকিয়ে-শুকিয়ে মরে যেত! পিদিমটাও তেল ফুরিয়ে নিভে গেলে অন্ধকারে ডাঁশ-পোকা সব বেরিয়ে তার গায়ের মাংস ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত। সেই সময় গোখরো সাপ ডাঁশের লোভে হাঁড়ি ভেঙে বেরিয়ে এসে মরা ছেলের ফাঁপা-মাথার খুলিটার মধ্যে বাসা বেঁধে ধন-দৌলত আগলাত। আর ছেলেটা যক্ হয়ে সেই অন্ধকারে খিদের জ্বালায় কেবলি কাঁদত আর..."

এই পর্যন্ত শুনেই রিদয়ের এমন ভয় হল যে সে ভাবলে যেন তার চারদিকে অন্ধকারে ডাঁশ-পোকাগুলো বেরিয়েছে, আর যেন লক্ষ্মীর ঝাঁপিটার মধ্যে থেকে গোখরো সাপ ফোঁসলাচ্ছে!

ইঁদুর রিদয়কে ভয় দেখিয়ে বললে—"শুনলে তো? এখন ছেলে-ধরা তোমাকে দেখেছে কি ধরে যকে বসিয়েছে! পালাও এইবেলা, মানুষের কাছে আর এগিয়ো না, ধরা পড়লে মুশকিল!" বলেই ইঁদুর কুলুঙ্গিতে উঠে বসল।

রিদয় কেঁদে বললে—"আর কি আমি মানুষ হব না?"

ইঁদুর হেসে বললে—"গণেশঠাকুরের দয়া না হলে আর মানুষ হওয়া হচ্ছে না।"

রিদয় আরও ভয় পেয়ে শোধালে—"গণেশ গেলেন কোথা? তাঁর দেখা পেলে যে আমি পায়ে ধরে মাপ চাই। এবার যদি তিনি আমায় মানুষ করে দেন, তবে নিশ্চয় বলছি কোনো দিন সন্দেশ চুরি করে খাব না, খেয়ে আর মিছে কথা বলব না, পড়বার সময় আর মিছি-মিছি মাথা ধরবে না, তেষ্টাও পাবে না; গুরুমশায়কে দেখে আর হাসব না, বাপ-মায়ের কথা শুনব; রোজ তোমার চন্নামেত্তো খাব, একশো দুর্গানাম লিখব। এবার থেকে বামুনের দোকানে পাউরুটি আর হাঁসের ডিম ছাড়া অন্য কিছু ছুঁই তো গঙ্গাস্নান করব।"

এমনি ভালোমানুষ হবার যত-কিছু প্রতিজ্ঞা কোনোটা করতে রিদয় বাকি রাখলে না! কিন্তু এতেও গণেশ খুশি হয়ে তাকে মানুষ করে দিতে ঘরে এলেন না দেখে বাইরেটায় সে একবার গণেশকে খুঁজে দেখবার মতলবে দরজার ফাঁক দিয়ে গলে বেরুল।

পাড়াগাঁয়ের সব বাড়ি যেমন, রিদয়দের বাড়িও তেমনি ছিল—'পুবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ, উত্তর বেড়ে, দক্ষিণ ছেড়ে।' ঘরের দাওয়া থেকে নেমেই একহাত-অন্তর একখানা চৌকো টালি পাতা রয়েছে। এমনি নানা দিকে সোজা-বাঁকা, ভাঙা-আস্ত টালিগুলো মাটির উপরে পেতে রাস্তা হয়েছে—পুকুর-পাড়ে যাবার, গোয়ালে যাবার, হেঁসেলে ঢোকবার। বর্ষার সময় যখন জলে সব ডুবে যায়, তখন এই টালির উপর পা ফেলে চালে যাও, একটুও পায়ে জল লাগবে না। আবার যেখানে জল যাবার নালা, তার উপরে এপার-ওপার করবার জন্যে দু'টুকরো নারকোল-গাছের গুঁড়ি পাটাতন করে পাতা, পুলের মতো তার উপর দিয়ে সোজা চলে যাও।

রিদয় এখনো থেকে-থেকে ভুলে যাচ্ছে যে সে আর বড় নেই, ঘরের দাওয়া থেকে আগেকার মতো লাফিয়ে নামতে গেছে, আর অমনি চিৎপাত! মনে হল যেন একতলার উপর থেকে পড়েছে! ভাগ্যি এক-আঁটি খড়ের উপরে পড়েছিল, না হলে রিদয় সেদিন টের পেতেন বেরাল-ছানাকে দাওয়া থেকে হঠাৎ ঠেলে ফেললে, কতটা তার লাগে।

গোটাকতক ছাতারে-পাখি বাঁশঝাড়ের তলায় শুকনো পাতা উল্টে-উল্টে ফড়িং খেয়ে বেড়াচ্ছিল, বুড়ো-আংলা ডিগবাজি-খেয়ে পড়ে যেতে দেখে বলে উঠল—"ছি-ছি! ও হিরিদয় হল কি? ছি-ছি!" অমনি কুবোপাখি বাঁশের ডগা থেকে বলে উঠল—"দুয়ো, বেশ হয়েছে, দুয়ো!" আর অমনি চারদিক

থেকে হাঁস, হাঁসের ছানা, মুরগি, মুরগির ছানা, কাদাখোঁচা, পানকৌড়ি এমনি সব ঘরের আশপাশের পোষা-পাখি বুনো-পাখি, মজা দেখতে ছুটে এসে রিদয়কে ঘিরে চেঁচাতে লাগল, হাসতে থাকল—"ছি-ছি, ছ্যা-ছ্যা, দেখ-দেখ! ঠিক হয়েছে! বেশ হয়েছে! বুড়ো-বুড়ো-বুড়ো-বুড়ো-আংলা! ও হিরিদয় হল কি?" কুঁকড়ো ঘাড় ফুলিয়ে বললে—"কি হল।" চড়াই ল্যাজ নেড়ে বললে—"এ কি, যক্ নাকি?"

রিদয় যখন মানুষ ছিল, তখন পাখিদের কিম্বা জানোয়ারদের কথা একটুও বুঝত না, কিন্তু যক্ হয়ে পরিষ্কার বুঝতে পারছে।

কুঁকড়ো বলছে—"কেমন, আর আমার ঝুঁটি ধরে টানবে?"

মুরগি অমনি বললে—"যেমন দুষ্টুমি, তেমনি শাস্তি হয়েছে! চুরি কর আমার ছানা! এইবারে এক ঠোকরে মাথা ফুটো করে দেব।" বলে মুরগিটা রিদয়কে ঠোঁট বাড়িয়ে তেড়ে গেল।

পাতি-হাঁস অমনি বলে উঠল—"থাক, থাক, এবার মাপ কর!"

কুঁকড়ো মাথা নেড়ে বলল—"তোর এমন দশা করলে কে?"

রাজহাঁস অমনি নাক-তুলে শুধোলে—"এ্যাঁঃ?"

রিদয় পাখিদের কথা বুঝতে পারছে জেনে মনে-মনে খুশি হল বটে, কিন্তু মুরগি, হাঁস—যারা একদিন তাকে দেখলে ভয়ে দৌড় দিত, এখন তারা মুখের সামনে দাঁড়িয়ে হাসবে, এটা রিদয় সইতে না পেরে, এক ঢিল ছুঁড়ে ধমকে উঠল—"প্যাঁক-প্যাঁক করিসনে বলছি—পালা!"

রিদয় যে এখন এতটুকু হয়ে গেছে! পাখিরা তাকে ভয় করবে কেন? সব পাখি একসঙ্গে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে তেড়ে উঠল—"দূর হ, দূর হ! পালা।" ধাড়ি-বাচ্ছা সব পাখি চারদিকে ঘিরে এমনি চেঁচামেচি করতে থাকল যে রিদয়ের কানে তালা ধরবার যোগাড়! বেচারা কোথায় পালাবে ঠিক পাচ্ছে না, এমন সময় আঁস্তাকুড় থেকে ছাই-পাঁশ মেখে বাঘের মতো ডোরা-টানা এক বেরাল, চান সেরে সেইদিকে আসতে লাগল—"কিও-কিও" বলতে-বলতে! বেরালের সাড়া পেয়েই পাখিরা যেন কত ভালোমানুষের মতো, মাটিতে যেন পোকাই খুঁজছে, এই ভাবে পায়ে-পায়ে রিদয়ের কাছ থেকে সরে পড়ল।

বেরাল ষষ্ঠীর বাহন, ইঁদুরের সঙ্গে গণেশ কোথায় লুকিয়ে আছেন নিশ্চয়ই সে জানে, ভেবে রিদয় দৌড়ে গিয়ে বেরালকে গণেশের কথা শুধোলে। বেরাল অমনি ল্যাজ গুড়িয়ে, সামনে দুই থাবা রেখে, গম্ভীর হয়ে বসে চোখ পিট-পিট করতে-করতে যেন রিদয়ের কথা শুনেও শুনলে না—এইভাবে পায়ের আঙুল থেকে ল্যাজের ডগাটি পর্যন্ত রোদে বসে চেটে-চেটে সাফ করতে লাগল। রিদয় একবার পাখিদের রাগিয়ে জব্দ হয়েছে; সে বেরালকে খুব মিষ্টি করে আবার শুধোলে—"বল না মেনি, গণেশঠাকুর কোনদিকে গেলেন?"

মেনি বললে—"গণেশঠাকুর কাছেই এক-জায়গায় আছেন, কিন্তু তোমাকে বলছিনে বাপু!"

রিদয় আরো নরম হয়ে বললে—"লক্ষ্মীটি, বল, কোথায়? তিনি আমার কি দশা করেছেন দেখছ!"

বেরাল যেন অবাক হয়ে সবুজ চোখ-দুটো বড় করে রিদয়ের দিকে চাইলে; তারপর গোঁফ ফুলিয়ে ফ্যাঁচ করে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললে—"তোমায় দেখে দুঃখু হবে না? আমার ল্যাজে কত কাঁকড়া ধরিয়েছ তুমি! তোমাকে গণেশের খবর দেব না তো দেব কাকে? হুঁঃ!" বলে বেরাল একবার গা ঝাড়া দিলে।

রিদয় আর রাগ সামলাতে না পেরে "দেখবি ল্যাজ ধরে টানি কি না" বলে যেমন বেরালের দিকে এগিয়ে গেছে অমনি বেরাল বাঘের মতো ফুলে উঠল! তার রোঁয়াগুলো সজারুর কাঁটার মতো সোজা হয়ে উঠেছে, পিঠ ধনুকের মত বেঁকেছে। ল্যাজ ফুলিয়ে কানদুটো সটান করে কটমট করে চেয়ে বেরাল নখে মাটি আঁচড়াতে লাগল।

রিদয় বেরাল দেখে ভয় পাবার ছেলে নয়। যেমন সে তেড়ে বেরালকে ধরতে গেছে, অমনি বেরাল ফ্যাঁচ করে হেঁচে এক থাপ্পড়ে রিদয়কে উল্টে ফেলে তার বুকে দুই পা দিয়ে চেপে বসে দাঁত-খিঁচিয়ে

বললে—"আবার বজ্জাতি! এখনো বুঝি শিক্ষা হয়নি? বুড়ো আংলা কোথাকার! জানিস, এখন নেংটি ইঁদুরের মতো তোকে ঘাড়-মটকে খেয়ে ফেলতে পারি!"

বেরাল যে ইচ্ছে করলে এখনি নখ দিয়ে তার বুকটা চিরে, দাঁত দিয়ে তার কান দুটি কেটে নিতে পারে, তা বাঘের মতো বেরালের নিজ-মূর্তি দেখে রিদয় আজ বেশ বুঝলে। সে নিজে যে আজ কত ছোট হয়ে গেছে, তাই ভেবে রিদয়ের চোখে জল এল। চোখে জল দেখে বেরাল রিদয়কে ছেড়ে দিয়ে বললে—"ব্যাস! আজ এইটুকু শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দিলুম—তোর মায়ের অনেক নিমক খেয়েছি! আজ দেখিয়ে দিলুম তোর জোর বেশি, না আমার জোর বেশি! আর কখনো পশুপাখির সঙ্গে লাগতে যাসনে—যাঃ!" বাঘের মাসি বেরাল চারপায়ে দাঁড়িয়ে একবার গা-ঝাড়া দিয়ে ল্যাজটা বুড়োআঙুলের মতো দুবার রিদয়ের মুখের সামনে নেড়ে আবার ভালোমানুষটির মতো আস্তে-আস্তে হেঁসেলের দিকে চলে গেল। রিদয় লজ্জায় মাথা হেঁট করে আস্তে-আস্তে গোয়াল-বাড়িতে গণেশকে খুঁজতে চলল।

ধলা গাই, কপ্‌লে গাই, কালো গাই—তিন গাই গোয়ালে বাঁধা। রিদয় কাছে আসতেই এই তিন গাই এমনি দাপাদাপি হামাহামি শুরু করে দিলে যে মনে হল তিরিশটা ষাঁড় সেখানে হুটোপাটি লাগিয়েছে! রিদয় শুনলে ধলা বলছে—"হবে না? মাথার উপর ধর্ম আছেন। হুঁ হুঁ!"

কপ্‌লে গাই বললে—"আমার কানে বোলতা ছাড়া? হুঁ হুঁ!"

এই সময় রিদয়কে গোয়ালের দুয়োরে দেখে কালো গাই লাথি ছুঁড়ে বললে—"খবরদার! দেখেছ, এক লাথিতে মাথার খুলি ফাটিয়ে দেব।"

ধলা বললে—"আয় না, এইবার শিং ধরে নাড়া দিবি!"

কপ্‌লে বললে—"একবার বোলতা নিয়ে কাছে এস না, মজাটা টের পাইয়ে দিচ্ছি!"

কালো—সে সব-চেয়ে বুড়ি, সব-চেয়ে জোরালো গাই, সে বললে—"বড় যে আমাকে ঢিল মারা হত। আবার সেদিন আমাকে জুতো ছুঁড়ে মারা হয়েছিল! আয়, একবার আমার খুরের ঘা খেয়ে যা! রোজ দুধ-দুইবার সময় দুধের কেঁড়ে উল্টে দিয়ে মাকে নাস্তানাবুদ করে তবে ছাড়তিস। আহা, এমন দিন নেই যে তিনি তোর জন্য না কেঁদেছেন। আয়, আজ একবার তার শোধ তুলব। বাপরে বাপ, কি দুষ্টু ছেলে গো! গণেশঠাকুর—তাঁর সঙ্গে লাগা!"

রিদয় গরুদের সঙ্গে ভাব করে বলতে চাইছিল—যদি তারা গণেশঠাকুরকে দেখিয়ে দেয়, তবে কোনোদিন আর সে কারো কাছে কোনো অপরাধ করবে না; কিন্তু গাই তিনটে এমনি ঝাঁপাঝাঁপি আরম্ভ করলে যে রিদয়ের ভয় হল যদি দড়ি ছিঁড়ে এরা বেরোয়, তবে আর রক্ষে রাখবে না! সে আস্তে-আস্তে গোয়াল ছেড়ে সরে পড়ল।

পশু-পাখি কেউ তাকে তো দয়া করলে না! গণেশের দেখা যদিই বা পাওয়া যায়, তবে তিনিও যে এদেরই মতো তাকে খেদিয়ে দেবেন না, তারই বা ঠিক কি! সবার কাছে তাড়া খেয়ে বেচারা রিদয় বেড়ার ধারে মুখ-চুন-করে এসে বসল। এ-জন্মে আর সে মানুষ হবে, এমন আশা নেই। মা-বাপ হাট থেকে যখন এসে দেখবেন ছেলেটি যক্ হয়ে গেছে, তখন তাঁদের দুঃখের আর সীমা থাকবে না! সে তো জানা কথা। কিন্তু পাড়ার লোক, এমন কি ভিন-গাঁ থেকে ছেলে-বুড়ো সবাই বুড়ো-আংলা দেখতে দলে-দলে এসে তাকে ঘেরাও করবে। হয়তো কাগজওয়ালারা তার ছবি তুলে ছাপিয়ে দেবে নিচে বড়-বড় করে লিখে—"আমতলিতে এই অবতারটি নষ্টামির ফল পেয়েছেন—ইনি দ্বিতীয়কালাপাহাড়, হিন্দুকুলকলঙ্ক!" হয়তো বা কোনদিন আলিপুরের চিড়িয়াখানায় নতুন জানোয়ার বলে টিকিট-মারা খাঁচায়, নয়তো তেলে ভেজে যাদুঘরের কাঁচের সিন্দুকে চাবি দেওয়া হবে! রিদয় আর ভাবতে পারলে না, দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল! আর সে মানুষের ছেলেদের সঙ্গে খেলতে পাবে না, সবাই তাকে দেখলে যক্ বলে সরে যাবে, কেউ তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে না, আর এই ঘর-বাড়ি—রিদয় তাদের বাড়ির দিকে চেয়ে দেখলে। খড়ের চাল ছোট-ছোট তিনখানি থাকবার ঘর; তার চেয়ে ছোট রান্না-ঘরখানি; তার চেয়ে ছোট গোয়াল-ঘর; ঢেঁকিশাল, ধানের মরাই, আর এতটুকু সেই পুকুর; তার চারদিকে চারটিখানি শাক-সবজী। রিদয়দের বাড়ি নেহাত সামান্য-রকমের, কিন্তু তা হলেও এই সামান্য জমিটুকু—ক'খানি ঘর, হাঁসপুকুর,

বাঁশঝাড়, তেঁতুল-গাছটি নিয়ে, কি সুন্দরই ঠেকল! যেন একখানি ছবি! অথচ এই বাড়ি ছেড়ে কতবার রিদয় মনে করেছে পালাবে; আজ কিন্তু সেই বাড়ির দিক থেকে তার চোখ আর ফিরতে চায় না!

দিনটি আজ আমতলি গ্রামখানির উপর, তাদের এই ঘর ক'খানির উপর কি আলোই ফেলেছে! চারদিক ঝকঝক করছে, ঝুরঝুর করছে! পাখি গাইছে, ভোমরা উড়ছে; বাতাস ছুটেছে, নদী চলেছে—কল-কল, কুল-কুল, ফুর্‌ফুর্‌ ! চারদিক আজ উল্‌সে উঠেছে, কেবল মাঝে বসে রয়েছে রিদয়—একলাটি মুখ-চুন করে। সে ভাবছে, কোথায় যাবে—কি করবে? সে যক্‌ হয়েছে, মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক উঠে গেছে। গণেশের অভিশাপে এখন অন্ধকার পাতালপুরীতে সাপের সঙ্গে যক্‌ হয়ে থাকা ছাড়া আর কি উপায় আছে? গণেশের সন্ধান করে শিবের বাড়ি কৈলাস-পর্বত পর্যন্ত যদি তাকে হেঁটে যেতে হয়, তাও স্বীকার, কিন্তু পাতালপুরীতে সে কিছুতে যেতে পারবে না! এই প্রতিজ্ঞা করে রিদয় কোমর-বেঁধে উঠে দাঁড়াল! এই সময় সেওলায়-পিছল রাস্তা দিয়ে গুগলী আস্তে আস্তে চলেছে। রিদয়কে গুগলী শুধোলে—"কোথায় যাওয়া হচ্ছে এত তাড়াতাড়ি?"

রিদয় পাখিদের কাছে, পশুদের কাছে দাবড়ি খেয়ে টিট হয়ে গিয়েছিল, এবারে সে খুব ভদ্রতা করে উত্তর দিলে—"আজ্ঞে, আমি কৈলাস-পর্বতে শ্রীশ্রীগণেশঠাকুরের ছি-চরণে কিছু নিবেদন করতে যাচ্ছি। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

গুগলী উত্তর করলে—"আমি গঙ্গাসাগরে ছান কত্তি যেতেছি।"

রিদয় মুচকে হেসে শুধোলে—"কতদিনে সেখানে পৌঁছবেন?"

"যে কয়দিনে পারি।" বলে গুগলী রিদয়কে শুধোলে—"কৈলাস-পর্বতে তুমি কহন পৌঁছাবে?"

"বোধ হয় দুচারদিনে।" বলে রিদয় আস্তে-আস্তে গুগলীর সঙ্গে চলল।

গুগলী খানিক চুপ করে থেকে বললে—"আমি বোধকরি দ্যেড় দিনট্যেকের মধ্যেই গঙ্গাসাগরে পৌঁচে যাব, কি বল?"

রিদয় এবার ঘাড়-নেড়ে বললে—"তা কেমন করে হবে? যে গুটিগুটি আপনি চলেছেন, তাতে ঐ হাঁসপুকুরে পৌঁছতেই তো আপনার একদিন লাগবে।"

গুগলী বললে—"ওহান থিকে না হয় বড় জোর একটা দিন লাগুক। পুকুরের ওপারটাতেই তো সুমুদ্দুর!"

রিদয় হেসে বললে—"তবেই হয়েছে! পুকুরের ওধারে পুকুরের পাড়, তারপরে সবজী-ক্ষেত, তার ওধারে তেপান্তর মাঠ, মাঠের ওধারে সব গ্রাম। গ্রামের পর বন, বনের পর নদী, নদীর ওপারে নগর, নগরের পরে উপনগর, তার পরে উপবন, উপবনের পরে উপদ্বীপ, তারপর উপসাগরের উপকূল, তারপর উপসাগর—যেখানে গঙ্গার স্রোত গিয়ে পড়েছে। দেড়-দিন কি, দেড়-বছরে সেখানে পৌঁছতে পারেন কি না সন্দেহ। কেন মিছে হাঁটছেন? নিজের ঘরে ফিরে যান!"

গুগলী ভাবলে রিদয় তার সঙ্গে মস্কারা করছে। সে আকাশে নাক তুলে বললে—"আর তুমি ভাবছ দিন চারেকে কৈলাস-পর্বতে যাবা—এই পিঁপড়ার মতো সরু–সরু ঠ্যাং চালিয়ে? যদি দিন রাত চলি যাতি পার, তথাপি চার-বছরে তুমি সেহানে পৌঁছিতি পার কিনা সন্দেহ। এই আমতলি, ইহার পর জামতলি, তেঁতুলতলি, বটতলি—অমনি পর-পর কত যে গ্রাম তার ঠিকানা মেলে না। তারপরে নদীর ধারে এ-নগর, সে-নগর; উপনদীর ধারে সকল উপনগর; তৎপরে এ-ঘাট, ও-ঘাট, সে-ঘাট; এ-মাঠ, ও-মাঠ, সে-মাঠ; এ-বন, ও-বন, সে-বন; তাহার পর উপত্যকা, উপত্যকা বাদ পাহাড়তলী, তৎপরে চিত্রকূট, ত্রিকূট, পরেশনাথ, চন্দ্রনাথের পাহাড়-পর্বত; তাহার পর বিন্ধ্যাচল, তাহার পর সীমাচল তবে হিমাচল! তৎপরে রামগিরি, তাহার পরে ধবলগিরি, তৎপরে মানস-সরোবর, উহার ওধারে তিব্বত, আরো ওধারে কৈলাস–পর্বত। এই নদ-নদী পাহাড়-জঙ্গল ভাংতি-ভাংতি সেহানে যাওয়া গঙ্গা-ফড়িংটির-প্রায়—তোমার

কর্ম! পক্ষীরাজ-ঘোড়া যে, সেও সেহানে যাতি পারে না চারি হপ্তায়, তুমি তো তুমি! ঘরের ছেলে ঘরে গিয়া বৈসা থাহ; কৈলাসের আশা ছাড়ি দ্যেও।”

রিদয় বললে—“আমি যেখানে যাব বলে বেরিয়েছি, সেখানে যাবই!”

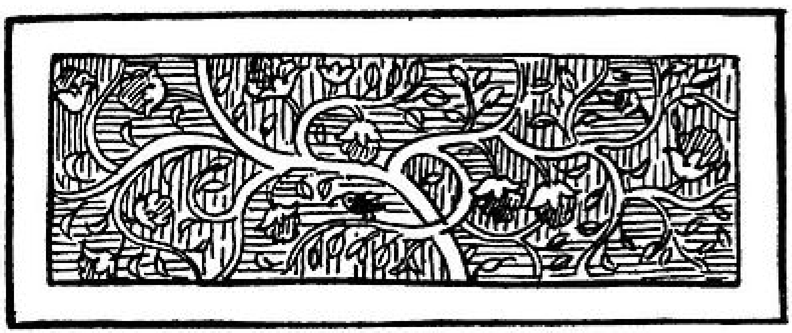
গুগলীও বললে—“আমিও যেহ্যনে যাত্রা করি বাইরেচি, এই বেদ্ধোকালে, সেহ্যেনে গঙ্গাসাগরে না যাইয়া আমি ছাড়মুনি।”

ঠিক সেই সময় খোঁড়া-হাঁস পুকুর থেকে ছপ-ছপ করে উঠে এসে টুপ করে গুগলীটিকে খেয়ে মাঠের দিকে চলল। রিদয় তাকে শুধোলে—“কোথায় যাওয়া হচ্ছে?”

“মানস-সরোবরে!” বলে হাঁস হেলতে-দুলতে আগুয়ান হল।

রিদয় দেখলে বড় সুবিধে, মানস-সরোবর পর্যন্ত হাঁসের সঙ্গে যাওয়া যাবে; তারপর তিব্বত, তার পরেই কৈলাস। সে আর কোনো কথা না বলে তার মা সুবচনী-ব্রত করতে যে খোঁড়া-হাঁস পুষেছিলেন, তারি সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

চলন বিল



মানুষ যেমন, গুগলীও তেমনি হাঁটা-পথে চলে, কাজেই কৈলাস যাবার হাঁটা-পথের খবরই গুগলী রাখত। কিন্তু মাটির উপর দিয়ে হাঁটা-পথ যেমন, তেমনি আকাশের উপর দিয়ে জলের নিচে দিয়ে সব পথ আছে, সেই রাস্তায় পাখিরা মাছেরা দূর-দূর দেশে যাতায়াত করে। মানুষ, গরু, গুগলী, শামুক—এরা সব পাহাড়-জঙ্গল ভেঙে, নদী পেরিয়ে চলে, কাজেই কোথাও যেতে এদের অনেক দিন লাগে। মাছেরা এঁকে-বেঁকে এ-নদী সে-নদী করে যায়, তাদের ডাঙায় উঠতে হয় না, কাজেই তারা আরো অল্পদিনে ঠিকানায় পৌঁছয়। আর পাখিরা নদী-ডাঙা দুয়েরই উপর দিয়ে সহজে উড়ে চলে—সব চেয়ে আগে চলে তারা! কিন্তু তাই বলে পাখিরাও যে পথের কষ্ট একেবারেই পায় না, এমন নয়। আকাশের নানাদিকে নানা-রকম নরম-গরম হাওয়া নদীর স্রোতের মতো বইছে—এই সব স্রোত বুঝে পাখিদের যাতায়াত করতে হয়। এ ছাড়া বড় পাখিরা যে রাস্তায় চলে, ছোট পাখিরা সে সব রাস্তায় গেলে, তাদের বিপদে পড়তে হয়—হয়তো ঝোড়ো হাওয়াতে কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে পড়ল তার ঠিক নেই!

আবার বড় পাখিদের যে-পথে কম বাতাস, সে-পথে গেলে ওড়াই মুশকিল—ডানা নাড়তে-নাড়তে কাঁধ ব্যাথা হয়ে যায়! বাতাসের এক-একটা পথ এমন ঠাণ্ডা যে সেখনে খুব শক্ত পাখিরা ছাড়া কেউ যেতে পারে না—শীতে জমে যাবে। কোনো রাস্তায় এমন গরম বাতাসের স্রোত চলেছে যে সেখানে আগুনের ঝলকে পাখা পুড়ে যায়। এ ছাড়া জোয়ার-ভাটার মতো অনুকূল-প্রতিকূল দু'রকম হাওয়া বইছে—সেটা বুঝেও পাখিদের যাওয়া-আসা করতে হয়। সব পাখি আবার রাতে উড়তে পারে না, সেজন্য যে-দিক দিয়ে গেলে বন পাবে, নদী পাবে, আকাশ থেকে নেমে দু'দণ্ড বসে জিরোতে পাবে—এমন সব যাবার রাস্তা তারা বেছে নেয়। এর উপরে আকাশ দিয়ে মেঘ চলাচল করছে; জলে-ধোঁয়ায়-ঝাপসা এই সব মেঘের রাস্তা কাটিয়ে পাখিদের চলতে হয়; না হলে ডানা ভিজে ভারি হয়ে, কুয়াশায়, ধোঁয়ায় দিক ভুল হয়ে, একদিকে যেতে আর-এক-দিকে গিয়ে পড়বে। এমনি সব নানা ঝনঝট বাতাসের পথে আছে; কাজেই পাখিদের মধ্যে পাকা মাঝির মতো সব দলপতি-পাখি থাকে। পাণ্ডারা যেমন দলে-দলে যাত্রী নিয়ে তীর্থ করাতে চলে, তেমনি এরাও ভালো-ভালো রাস্তার খবর নিয়ে দলে-দলে নানা পাখি নিয়ে আনাগোনা করে—উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে, পুব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পুবে, সমুদ্র থেকে পাহাড়ের

দিকে, পাহাড় থেকে সমুদ্রের দিকে, পৃথিবীর একধার থেকে আর-একধারে নানা-দেশে নানা-স্থানে।

মানুষ যখন একদেশ থেকে আর-একদেশে চলে, সে নিজের সঙ্গে খাবার, জিনিস-পত্তর গুছিয়ে নিয়ে চলে। খুব যে গরীব, এমন কি সন্ন্যাসী সেও এক লোটা, এক কম্বল, খানিক ছাতু, ছোলা, আটা, দুটো মোয়া, নয়তো দুমুঠো মুড়িও সঙ্গে নেয়; কিন্তু পাখিদের এখান থেকে কিছু খেয়ে নিয়ে, সেখানে নেমে, সেখানে কিছু খেয়ে নিয়ে—এমনি খানিক পথ উড়ে, খানিক আবার ডাঙায় কিম্বা জলায়, কোথাও বা চরে, ঘাটে-ঘাটে জিরিয়ে খেয়ে-দেয়ে না নিলে চলবার উপায় নেই। বাচ্ছাদের জন্যে দূর থেকে পাখিরা মুখে করে, গলার থলিতে ভরে খাবার আনে; আর টিয়ে পাখি ঠোঁটে ধানের শিষ, হাঁস পদ্মফুলের ডাঁটা নিয়ে সময়-সময় এদিকে-ওদিকে উড়ে চলে বটে, কিন্তু দল-বেঁধে যখন তারা পাণ্ডার সঙ্গে দূর-দূর-দেশে যাত্রা করে বেরোয় তখন কুটোটি পর্যন্ত সঙ্গে রাখে না—একেবারে ঝাড়া-ঝাপটা হাল্কা হয়ে উড়ে যায়। রেলগাড়ি যেমন দেশ-বিদেশের মধ্য দিয়ে বাঁশি দিতে-দিতে স্টেশনে-স্টেশনে নতুন-নতুন লোক ওঠাতে-ওঠাতে চলে, এই পাখির দলও তেমনি আকাশ দিয়ে ডাক দিতে-দিতে চলে; আর এ-গ্রাম সে-গ্রাম এ-দেশ সে-দেশ এ-বন ও-বন থেকে যাত্রী-পাখি সব উড়ে গিয়ে ঝাঁকে মিশে আনন্দে মস্ত-এক দল বেঁধে চলতে থাকে। আকাশ দিয়ে একটার পর একটা ডাকগাড়ির মতো সারাদিন এমনি দলে-দলে যাতায়াত করে ডাক-হাঁক দিতে-দিতে—হাঁস, বক, সারস, পায়রা, টিয়া, শালিক, ময়না, ডাহুক-ডাহুকী—ছোট বড় নানা পাখি!

খোঁড়া হাঁসের সঙ্গে মানস-সরোবরে যাবার জন্যে রিদয় ঘর ছেড়ে মাঠে এসে দেখলে নীল আকাশ দিয়ে দলে-দলে বক, সারস, বুনোহাঁস, পাতিহাঁস, বালুহাঁস, রাজহাঁস সারি দিয়ে চলেছে। এই সব পাখির দল পুবে সন্দ্বীপ থেকে ছেড়ে আমতলির উপর দিয়ে দুভাগ হয়ে, এক ভাগ চলেছে—গঙ্গাসাগরের মোহানা ধরে গঙ্গা-যমুনার ধারে-ধারে হরিদ্বারের পথ দিয়ে হিমালয় পেরিয়ে মানস সরোবরে; আর-একদল চলেছে—মেঘনানদীর মোহানা হয়ে আমতলি, হরিংঘাটা, গঙ্গাসাগর বাঁয়ে ফেলে, আসামের জঙ্গল, গারো-পাহাড় খাসিয়া-পাহাড় ডাইনে রেখে, ব্রহ্মপুত্র নদের বাঁকে-বাঁকে ঘুরতে-ঘুরতে হিমালয় পেরিয়ে তিব্বতের উপর দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা ধবলাগিরির উত্তর-গা ঘেঁষে সিধে পশ্চিম-মুখে মানস-সরোবরে। সমুদ্রের দিক থেকে গঙ্গাসাগরের পথ পশ্চিম-উত্তর হয়ে হিমালয় পেরিয়ে পুবে ঘুরে পড়েছে মানস-সরোবরে; আর ব্রহ্মপুত্রের পথ উত্তর-পুব হয়ে পশ্চিম ঘুরে শেষ হয়েছে মানস-সরোবরে—যেন বেড়ির দুই মুখ এক জায়গায় গিয়ে মিলেছে। এই বেড়ির মিলের কাছে রয়েছে সুন্দর-বন আর আমতলি; মাঝখানে অন্নপূর্ণার অন্নপাত্র সুজলা সুফলা সোনার বাঙলা-দেশ; ডাইনে আসাম; বাঁয়ে বেহার অঞ্চল।

সুবচনীর খোঁড়া হাঁস রিদয়ের সঙ্গে মাঠে বেরিয়ে প্যাঁক-প্যাঁক করে আপনার মনেই বকতে-বকতে চলল—"উঃ বাবারে! আর যে চলতে পারিনে! পা ছিঁড়ে পড়ছে! কেন এলুম গো, মরতে ঘর থেকে বেরিয়ে ছিলুম! এতদূরে মানস-সরোবর কে জানে গো—এ্যাঁঃ!" খোঁড়া হাঁস হাঁপাচ্ছে আর চলছে আর বকছে। বাতে বেচারার পা-টি পঙ্গু। সে অনেক কষ্টে খাল-ধারে—যেখানে গোটাকতক বক, গোটাকতক পাতি-হাঁস চরছিল, সেই পর্যন্ত এসে উলুঘাসের উপরে খোঁড়া পা রেখে জিরোতে বসল।

রিদয় কি করে? একটা কচু-পাতার নিচে বসে আকাশের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল—দলে-দলে হাঁস উত্তর-মুখে উড়ে চলেছে—নানা কথা বলাবলি করতে-করতে! রিদয় শুনলে হাঁসেরা বাজে বকছে না; কাজের কথাই বলতে-বলতে পথ চলেছে।

সেথো হাঁসেরা বললে—"থাকে-থাকে ফুলের গন্ধ লাগছে নাকে!"

অমনি পাণ্ডাহাঁস যে সব আগে চলেছে, জবাব দিলে—"ছুটলে খোসবো বাদলা রাখে।"

সেথোরা বললে—"নিচে-বাগে নামল তাল-চড়াই!"

পাণ্ডা উত্তর করলে—"উপরে বড়ই ঠাণ্ডা ভাই!"

সেখোরা বললে—"জাল টেনে মাকড় দিল চম্পট!"

পাণ্ডার জবাব হল—"এল বলে বৃষ্টি—চল চটপট!"

সেথোরা বললে—"সব দিল ঘোমটা টেনে।"

পাণ্ডা বললে—"এল বিষ্টি এল হেনে!"

"ছুঁচোয় গড়েছে মাটির ঢিপি।"

"বিষ্টি পড়বে টিপিটিপি।"

"সাগরের পাখি ডাঙায় গেল।"

"ঝড়-জল বুঝি এবার এল"

"কাক যে বাসায় একলা বড়!"

"গতিক খারাপ; নেমে পড়, নেমে পড়।"

অমনি সব হাঁস ঝুপ-ঝুপ করে খালে-বিলে নেমে পড়ে আপনার-আপনার পিঠের পালকগুলো জল দিয়ে বেশ করে ভিজিয়ে নিলে, পাছে পালকগুলো শুকনো থাকলে বিষ্টির জল বেশি করে চুষে নেয়। দেখতে-দেখতে ঝড়ো-বাতাস ধুলোয়-ধুলোয় চারদিক অন্ধকার করে দিয়ে বড়-বড় গাছের আগ দুলিয়ে শুকনো ডাল-পাতা উড়িয়ে হুহু করে বেরিয়ে গেল। তারপরই একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল—খাল-বিল ভর্তি করে দিয়ে। একটু পরে বিষ্টি থেমে আবার রোদ উঠল; তখন দলে-দলে হাঁস, বক, সারস আবার চলল—আকাশ পথে আগের মতো বলাবলি করতে-করতে—

"মাকড় আবার জাল পেতেছে।"

"আর ভয় নেই—রোদ এসেছে।"

"মৌচাক ছেড়ে মাছিরা ছোটে।"

"বাদলের ভয় নাইকো মোটে।"

"বনে-বনে ওঠে পাখির সুর।"

"উড়ে চল, পার যতদূর।"

"আকাশ জুড়িল রামধনুকে!"

"চল—গেয়ে চল মনেরি সুখে।"

আগে-আগে পাণ্ডা-হাঁস চলেছে, পিছে-পিছে তীরের ফলার মতো দু'সারি হাঁস ডাক দিতে-দিতে উড়ে যাচ্ছে। অনেক উপর দিয়ে একদল ডাক দিয়ে গেল—"পাহাড়তলি কে যাবে? পাহাড়তলি!" বুনো হাঁসের ডাক শুনে পোষা-পালা খালের বিলের হাঁস, তারা ঘাড় তুলে যে যেখানে ছিল জবাব দিলে—"যে যায় যাক, আমরা নয়।" মাটির উপরে যারা, তারা মুখে বলেছে—"যাব না" কিন্তু আকাশ এমনি নীল, বাতাস এমনি পরিস্কার যে মন তাদের চাচ্ছে উড়ে চলি—ঐ আলো-মাখা হাওয়ার ডানা ছড়িয়ে হুহু-করে! যেমন এক-এক দল বুনোহাঁস মাথার উপর দিয়ে ডাক দিয়ে যাচ্ছে, আর অমনি যত পালা-হাঁস তারা চঞ্চল হয়ে পালাই-পালাই করছে। দু'চারটে বা ডানা ঝটপট করে এক-একবার উড়ে পড়তে চেষ্টা করলে, অমনি বুড়ি হাঁস ঘাড় নেড়ে বলে উঠল—"এমন কাজ কর না। আকাশ-পথে চলার কষ্ট ভারি, পাহাড় দেশে শীত বিষম, কিছু মেলে না গো, কিছু মেলে না!"

বুনো-হাঁসের ডাক শুনে সুবচনীর খোঁড়া হাঁস উড়ে পড়তে আনচান করতে লাগল। সে বকতে লাগল—"এইবার একদল হাঁস এলে হয়, ঝপ করে উড়ে পড়ব! আর পারিনে বাপু মাটিতে খুঁড়িয়ে চলতে!"

সন্দ্বীপ থেকে বালু-হাঁসের দল হিমালয় পেরিয়ে একেবারে মানস-সরোবর পর্যন্ত যাবার জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়েছে; এবারে সেই দূর-দূরের যাত্রীরা আমতলির ঠিক উপর দিয়ে চলতে-চলতে ডাক দিতে থাকল টানা সুরে—"মানস-সরোবর! ধৌলাগিরি!"

খোঁড়া হাঁস অমনি উলু ঘাসের ঝোপ ছেড়ে গলা তুলে ডাক দিলে— "আসছি, একটু রও, একটু রয়ে ভাই, একটু রয়ে চল!" তারপর সে তার শাদা দু'খানা ডানা মেলে বাতাসে গা ভাসিয়ে দু-চার-হাত গিয়ে আবার ঝুপ করে মাটিতে পড়ল—বেচারা কতদিন ওড়েনি, ওড়া প্রায় ভুলে গেছে! খোঁড়া হাঁসের ডাক বালু-হাঁসেরা শুনেছিল বোধ হয়, তাই মাথার উপরে ঘুরে-ঘুরে তারা দেখতে লাগলো যাত্রী আসছে কি না! সুবচনীর হাঁস আবার চেঁচিয়ে বললে—"রও ভাই, একটু রয়ে!" তারপর যেমন সে উড়তে যাবে, অমনি রিদয় লাফ দিয়ে তার গলা জড়িয়ে—"আমিও যাব" বলে ঝুলে পড়ল!

খোঁড়া হাঁস তখন বাতাসে ডানা ছড়িয়ে উড়তে ব্যস্ত, রিদয়কে নামিয়ে দেবার সময় হল না, দু'জনেই মাটি ছেড়ে আকাশে উঠল। রিদয়কে নিয়ে খোঁড়া হাঁস বাতাস কেটে উপরে উঠছে—এমনি বেগে যে, মনে হল ডগায় ঝোলানো একটা টিকটিকি নিয়ে হাউই চলেছে। হঠাৎ সেই খোঁড়া হাঁস এমন তেজে মাটি ছেড়ে এত উপরে উঠে পড়বে, এটা হাঁসটা নিজেও ভাবেনি; রিদয় তো মনেই আনতে পারেনি—এমনটা হবে। এখন আর নামবার উপায় নেই—পায়ের তলায় মাটি কতদূরে পড়ে আছে তার ঠিক নেই, ডানার বাতাস ক্রমাগত তাকে ঝাপটা দিচ্ছে। রিদয় হাঁফাতে-হাঁফাতে অতি-কষ্টে গাছে—চড়ার মতো হাঁসের গলা ধরে আস্তে-আস্তে তার পিঠে চেপে বসল। কিন্তু এমনি গড়ানো হাঁসের পিঠ যে সেখানেও ঠিক বসে থাকা দায়—রিদয় ক্রমেই পিছনে পড়তে যাচ্ছে! দুখানা শাদা ডানার ওঠা-পড়ার মধ্যে বসে তার মনে হতে লাগল যেন শাদা দুটো সমুদ্রের ঢেউয়ের মাঝে সে দুলতে-দুলতে চলেছে। প্রাণপণে খোঁড়া হাঁসের পিঠের পালক দুই মুঠোয় ধরে, দুপায়ে গলা জড়িয়ে রিদয় স্থির হয়ে বসবার চেষ্টা করতে লাগল।

মাটির উপর দিয়ে খোঁড়া হাঁসের সঙ্গে পায়ে হেঁটে যাওয়া এক, আর এক-কুড়ি-একটা উড়ন্ত হাঁসের হাঁক-ডাক, চলন্ত ডানার ঝাপটার মধ্যে বসে ঝড়ের মতো শূন্যে উড়ে চলা আর এক! বাতাস তোলপাড় করে চলেছে হাঁসের দল! কুড়ি-জোড়া দাঁড়ের মতো ঝপাঝপ উঠছে-পড়ছে জোরাল ডানা! রিদয় দেখছে কেবল হাঁস আর পালক বিজবিজ করছে! শুনছে কেবল বাতাসের ঝপঝপ, সোঁ-সোঁ, আর থেকে-থেকে হাঁসেদের হাঁক-ডাক! উপর-আকাশ দিয়ে যাচ্ছে, না মেঘের মধ্যে দিয়ে চলেছে, কি মাটির কাছ দিয়ে উড়ছে, রিদয় কিছুই বুঝতে পারছে না!

উপর-আকাশে এমন পাতলা বাতাস যে হঠাৎ উঠে গেলে দম নিতে কষ্ট বোধ হয়, কাজেই নতুন-সেথো—খোঁড়া-হাঁসকে একটু সামলে নেবার জন্যে বালু-হাঁসের দল নিচেকার ঘন হাওয়ার মধ্যে দিয়ে বরং আস্তেই চলেছে, এতেই রিদয়ের মনে হচ্ছে যেন পাশাপাশি দুটো রেল-গাড়ি পুরোদমে ছুটেছে আর তারি মাঝে এতটুকু-সে দুলতে-দুলতে চলেছে! ওড়ার প্রথম চোটটা কমে এলে রিদয়ের হাঁস ক্রমে টাল সামলে সোজা তালে-তালে ডানা ফেলে চলতে শুরু করলে। তখন রিদয় মাটির দিকে চেয়ে দেখবার সময় পেলে। হাসের দল তখন সুন্দরবন ছাড়িয়ে বাঙলাদেশের বুকের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। রিদয় আকাশ থেকে দেখছে যেন সবুজ-হলদে-রাঙা-মেটে-নীল এমনি পাঁচ-রঙের ছক-কাটা চমৎকার একখানি কাঁথা রোদে পাতা রয়েছে। রিদয় ভাবছে এ কোনখানে এলেম? সেই সময় বাখরগঞ্জের ধানখেতের উপর দিয়ে হাঁসেরা চলল। রিদয় দেশটা দেখে ভাবলে প্রকাণ্ড একটা যেন সতরঞ্জ-খেলার ছক নিচের জমিতে পাতা রয়েছে।

রিদয় ভাবছে—"বাস রে! এত বড় খেলার ছক, রাবণের দাবা খেলে নাকি?" অমনি যেন তার কথার উত্তর দিয়ে হাঁসেরা হাঁক দিলে—"খেত আর মাঠ, খেত আর মাঠ—বাখরগন্জো!" তখন রিদয়ের চোখ ফুটল। সে বুঝলে সবুজ ছকগুলো ধান-খেত—নতুন শিষে ভরে রয়েছে! হলদে ছকগুলো সরষে-খেত—সোনার ফুলে ভরে গিয়েছে! মেটে ছকগুলো খালি জমি—এখনো সেখানে ফসল গজায়নি। রাঙা ছকগুলো শোন আর পাট। সবুজ পাড়-দেওয়া মেটে-মেটে ছকগুলো খালি জমির ধারে-ধারে গাছের সার। মাঝে-মাঝে বড়-বড় সবুজ দাগগুলো সব বন। কোথাও সোনালী, কোথাও লাল, কোথাও ফিকে নীলের ধারে ঘন সবুজ ছককাটা ডোরাটানা জায়গাগুলো নদীর ধারে গ্রামগুলি—ঘর-ঘর পাড়া-পাড়া ভাগ করা

রয়েছে। কতকগুলো ছকের মাঝে ঘন সবুজ, ধারে-ধারে খয়েরী রঙ—সেগুলো হচ্ছে আম-কাঁটালের বাগান—মাটির পাঁচিলেঘেরা। নদী, নালা, খালগুলো রিদয় দেখলে যেন রুপোলী ডোরার নক্সা—আলোতে ঝিকঝিক করছে। নতুন ফল, নতুন পাতা যেন সবুজ মখমলের উপরে এখানে-ওখানে কারচোপের কাজ!—যতদূর চোখ চলে এমনি! আকাশ থেকে মাটি যেন সতরঞ্চি হয়ে গেছে দেখে রিদয় মজা পেয়েছে ; সে হাততালি দিয়ে যেমন বলছে—"বাঃ, কি তামাশা!" অমনি হাঁসেরা যেন তাকে ধমকে বলে উঠল—"সেরা দেশ—সোনার দেশ—সবুজ দেশ—ফলন্ত-ফুলন্ত বাঙলাদেশ!"

রিদয় একবার গণেশকে নিয়ে হাসি-তামাশা করতে গিয়ে বিপদে পড়েছে, হাঁসের ধমক শুনে মুখ বুজে গম্ভীর ভালোমানুষটির মতে পিটপিট করে চারদিকে চাইতে লাগল আর মিটমিট করে একটু-একটু হাসতেও থাকল—খুব ঠোঁট চেপে। দলে-দলে কত পাখি—কেউ চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে, কেউ উত্তর থেকে দক্ষিণে, পুব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পুবে; আর পথের মাঝে দেখা হলেই এদল ওদলকে শুধাচ্ছে—এদিকের খবর, ওদিকের খবর—খবর কি ভাই, খবর কি? অমনি বলাবলি চলল— "ওধারে জল হচ্ছে।" "এধারে রোদে পুড়ছে।" "সেধারে ফল ফলেছে।" "এধারে বউল ধরেছে।" রিদয়কে নিয়ে চলতি হাঁসেরা পাহাড় থেকে একদল ফিরতি হাঁসকে শুধিয়ে জানলে—ওধারে এখনো কুয়াশা কাটেনি; শিল পড়ছে; জল হিম; গাছে এখনো ফল ধরেনি! অমনি তারা ঢিমে চালে চলতে আরম্ভ করলে। তাড়াতাড়ি পাহাড়-অঞ্চলে গিয়ে লাভ কি, বলে তারা এগ্রাম-সেগ্রাম, নদীর এপার-ওপার করতে-করতে ধীরে-সুস্থে এগোতে থাকল।

গ্রামে-গ্রামে ঘরের মটকায় কুঁকড়ো সব পাহারা দিচ্ছে। ঘাটিতে-ঘাটিতে চলন্ত পাখিরা তাদের কাছে খবর পাচ্ছে। "কোন গ্রাম?" "তেঁতুলিয়া, সাবেক তেঁতুলিয়া—হাল তেঁতুলিয়া।" "কোন শহর?" "নোয়াখালি—খটখটে।" "কোন মাঠ?" "তিরপুরণীর মাঠ—জলে থৈথৈ।" "কোন ঘাট?" "সাঁকের ঘাট—গুগলী ভরা।" "কোন হাট?" "উলোর হাট—খড়ের ধুম।" "কোন নদী?" "বিষনন্দী—ঘোলা জল।" "কোন নগর?" "গোপাল নগর—গয়লা ঢের।" "কোন আবাদ?" "নসীরাবাদ—তামুক ভালো।" "কোন গঞ্জ?" "বামুনগঞ্জ—মাছ মেলা দায়।" "কোন বাজার?" "হালতার বাজার—পলতা মেলে।" "কোন বন্দর?" "বাগাবন্দর—হুক্কাহুয়া।" "কোন জেলা?" "রুরুলী জেলা—সিঁদুরে মাটি।" "কোন বিল?" "চলন বিল—জল নেই।" "কোন পুকুর?" "বাধা পুকুর— কেবল কাদা।" "কোন দীঘি?" "রায় দীঘি—পানায় ঢাকা।" "কোন খাল?" "বালির খাল—কেবল চড়া।" "কোন ঝিল?" "হীরা ঝিল—তীরে জেলে।" "কোন পরগনা?" "পাতলে দ—পাতলা হ।" "কোন ডিহি?" "রাজসাই—খাসা ভাই!" "কোন পুর?" "পেসাদপুর—পিপড়ে কাঁদে।" "কার বাড়ি?" "ঠাকুর বাড়ি।" "কোন ঠাকুর?" "ওবিন ঠাকুর—ছবি লেখে।" "কার কাচারি?" "নাম কর না, ফাটবে হাড়ি!"

এমনি দেশের নাম, লোকের নাম, বাড়ির নাম, আর নামের সঙ্গে একটা করে বিশেষণ দিয়ে কুঁকড়ো, সব যেমন-যেমন প্রশ্ন হচ্ছে, সঙ্গে-সঙ্গে তার উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। যাত্রীরাও বুঝে নিচ্ছে কোন জায়গায় কি পাওয়া যায়, কোথায় নামলে বিপদ, কোথায় নিরাপদ—কোথায় কি খাওয়া পাওয়া যায় তা পর্যন্ত! মানুষে হয়তো দিয়েছে গ্রামের নাম 'ভদ্রপুর' কিন্তু সেখানে না আছে ফলের বাগান, চরবার খাল, বিল, মাঠ; লোকগুলোও চোয়াড়; পাখির ভাষায় সে গ্রামের নাম হল—'নরককুণ্ড'। কোনো দুদে জমিদার প্রজার সর্বনাশ করে তেতলা বাড়ি ফেদে তার নাম দিয়েছে 'অলকাপুরী' ; কিন্তু সেখানে কোনোদিন কারু পাত পড়ে না; শেয়ালকুকুর কেঁদে যায়; পাখিরা মিলে সে বাড়ির নাম দিলে 'পোড়াবাড়ি'। হয়তো একটা পাড়া—সেখানে ভণ্ড বৈরাগীর আড্ডা; তারা দিনে মালা জপে, রাতে বাড়ি-বাড়ি সিঁদ দিয়ে আসে ; সে জায়গাটার নাম মানুষ দিলে 'বৈরিগি পাড়া'; কিন্তু পাখিরা তাকে বললে নিগিরিটিং—ভাবটা যে কেবল এদের খঞ্জনীই সার! হয়তো এক ভালো পরগনার ভালো জমিদার কিন্তু পরগনার নাম মানুষে বলছে 'খোলা মুচি'; কিন্তু পাখিরা দেখচে সেখানে ধান খুব, ফল ভালো; ভালো জমিদার; বন্দুক-হাতে শিকারে বেরোয় না; আমনি সে পরগনার নাম তারা হাকলে—'রাজভোগ—সাবেক রাজভোগ—হাল রাজভোগ।' হয়তে 'রাজভোগ' যেমন, তেমনি কোনো ভালো পরগনা নষ্ট জমিদারের হাতে পড়ে উচ্ছন্ন গেল—সেখানে না মেলে ঘাস, না আছে ভালো জল, না আছে বাগান, থাকবার মধ্যে মাতাল জমিদারের বন্দুকের গুলী, দুঁদে নায়েবের লাঠি-সোটা; মানুষ সে পরগনার নাম 'লক্ষ্মীপুর' দিলেও পাখিরা তাকে বললে 'মশাল-চুলি'।

কোনো-কোনো জায়গায় সাতপুরুষ ধরে ভালো মানুষ, ভালো আবহাওয়া, ভালো খাওয়া-দাওয়া, খালবিল হাটবাজার গুলজার; সেখানকার কুঁকড়ো বুক-ফুলিয়ে হাকলে—"মনোহর নগর—সাবেক মনোহর নগর —হালে মনোহর।" এমনি যেখানে পাখিদের সুখ, সে সব জায়গার নাম এক-এক কুঁকড়ো হেঁকে দিচ্ছে—যেমন-যেমন হাসের দল, সারসের দল, মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে—"সোহাগদার, দৌলতপুর, সুনামগঞ্জ!" যেখানে ফলফুলুরী ফসল ঢের, সে সব জায়গার কুঁকড়োর হাঁকছে—"দানাসিরি, লাঙ্গলবাধ, উলুর হাট, আমতাজুড়ি, জাঙ্গিপুর!" হাঁস-পদ্মনাল এমনি সব খেতে পছন্দ করে, যেখানে খালে-বিলে এসব জন্মেছে, সেখানকার কুঁকড়ো হাঁকছে—"সাতনল, নলচিটে, পাতের হাট, বেতগাঁ, বেতাজী, সোলাভাঙা, শাকের হাট।" যেখানে খাবার নেই, তার কুঁকড়ো হাঁকলে—"ঝালকাটি, কাটিপাড়া, আশাশূন্যি, সন্ন্যাসীহাট।" যেখানে ছায়াকরা বন অনেক, সেখানকার নাম হাঁকলে কুঁকড়ো—"কমলাবাড়ি, ফুলঝুরি, ডাকেটিয়া, শিরিশদিয়া, কোকিলামুখ।" যেখানে ছোট-বড় নদী, ছোট-বড় মাছ, কুঁকড়ো হাঁকলে—"চাঁদাপুর, ইলশেঘাট, ব্যাঙধুই, বোয়ালিয়া, বোয়ালমারি।"

রিদয় দেখলে হাঁসেরা সোজা যে উত্তর-মুখো চলেছে, তা নয়। তারা এ-গ্রাম সে-গ্রাম, এ-খেত ও-খেত, এ-বিল ও-বিল, করে হরিংঘাট, মেঘনা—এই দুই নদীর মাঝে যা কিছু আছে সব যেন দেখতে-দেখতে চলেছে—বাঙলাদেশের সুন্দরবন, ধানখেত, পদ্মদীঘি বালুচর, খালবিল ছাড়তে যেন তাদের মন উঠছে না। বাখরগঞ্জ, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর হয়ে ধলেশ্বরী নদী পেরিয়ে ক্রমে হাঁসের দল চাঁদপুরের দিকে চলল—পুবমুখে।

হাঁসের মধ্যে ঘেংরাল আর সরাল দু-জাতের হাঁস—এরা কোনোদিন কোথাও যেতেও চায় না, নড়তেও চায় না—ভারি কুনো! বুনো হাঁস এদের দেখলেই তামাশা করতে ছাড়চে না। তারা উপর-আকাশ থেকে একের পর একে ডেকে চলল—"পাহাড়তলি, কামরূপ, ধৌলাগিরি, মানসসরোবর—চলেছি, চলেছি!" অমনি সরাল, ঘেংরাল এরা উত্তর দিচ্ছে—"যেও না যেও না, বড় শীত। যেও পরে, যেও পরে।"

বুনো হাঁসের দল আরো নিচে নেমে একসঙ্গে বলে উঠল—"ভারি মজা, উড়তে মজা—শীতে মজা-পাহাড়ে মজা। উড়তে শেখাব; চলে এস না!"

সরাল, ঘেংরাল কোথাও উড়ে যাবে না; যেখানকার সেখানে থাকবে, অথচ উড়তে পারে না বললে তারা ভারি চটবে; এবারে বুনো হাঁসের কথায় তারা জবাবই দিলে না। তখন বালু-হাঁসের দল একবারে মাটির কাছে নেমে এসে বলে উঠল—"ওরে হাঁস নয় রে—ভেড়া!" তারপর হাঃ-হাঃ করে হাসতে-হাসতে ডানায় তালি দিতে-দিতে আবার আকাশে উঠল। নিচে থেকে ঘোরো-হাঁস তারা গলা চিরে গালাগালি শুরু করলে—"মর, মর! গুলি খেয়ে মর, শীল পড়ে মর, বাতে ধরে মর, বাজ পড়ে মর, বিদেশে মর, বিভুঁয়ে মর!"

এমনি হাসি-তামাশার মধ্যে রিদয় আনন্দে চলেছে। কিন্তু তবু নিজের দুরবস্থা ভেবে—সে যে মা-বাপ ঘর-বাড়ি ছেড়ে কোথায় নির্বাসনে চলেছে, সে কথা মনে করে—এক-একবার তার চোখে জলও আসছে। কিন্তু তবু এই আকাশ দিয়ে একেবারে হুহু করে উড়ে চলায় কি মজা, কত আনন্দ! বাতাসে কোথাও ভিজে মাটির গন্ধ, কোথাও ফোটা-ফুলের খোসবো, কোথাও পাকা ফলের কি মিঠে বাসই আসছে! পৃথিবীর গায়ের বাতাস যে এমন সুগন্ধে ভরা রিদয় আগে তো জানেনি! মেঘের উপর দিয়ে জলের চেয়ে পরিষ্কার বাতাসের উপর দিয়ে ভেসে চলতে-চলতে রিদয়ের মনে হতে লাগল যেন সব দুঃখ, সব কষ্ট, পৃথিবীর যত কিছু জ্বালা-যন্ত্রণা ছেড়ে সে সত্যি উঠে এসেছে সেইখানে, যেখানে ধুলো নেই, বালি নেই, ভয় নেই, ভাবনা নেই, রোগ নেই, শোক নেই—কেবলি আনন্দে উড়ে চলা দিন-রাত!

চকা-নিকোবর



সুবচনীর খোঁড়া হাঁস এই সব বুনো-হাঁসদের দলে ভিড়ে উড়তে, আর এ-গ্রামের সে-গ্রামের সব সরাল, ঘেংরালদের দেখে হাসি-মস্করা করতে পেয়ে, ভারি খুশি হয়েছে। সে ভুলে গেছে যে নিজেই সে এত-কাল পালা-হাঁসই ছিল—ঐ সরাল-ঘেংরালের মতো ঘর আর পুকুর করে কাটিয়েছে। তার উপর সে আজন্ম-খোঁড়া, সবে আজ নূতন উড়ছে। বুনো হাঁসের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চলা তার কর্ম নয়! খোঁড়ার ডানার তেজ ক্রমেই কমছে আর দমও ক্রমে ফুরিয়ে আসছে, সে হাঁপাতে-হাঁপাতে তাড়াতাড়ি ডানা ঝাপটেও আর পেরে উঠছে না মধ্যে থেকে এক-এক-করে প্রায় আটহাঁস পিছিয়ে পড়েছে। সেথো হাঁসরা যখন দেখলে খোঁড়া পিছিয়ে পড়ে, আর পারে না, তখন পাণ্ডা-হাঁসকে ডাক দিয়ে জানালে—"চকা-নিকোবর, চকা-নিকোবর!"

চকা উড়তে-উড়তেই শুধোলে—"ক্যেঁন্-ক্যেঁন্ কও ক্যেঁন্?"

সেথোরা বললে—"পিছিয়ে পোলো খোঁড়া-ঠ্যাং!"

আগের মতো সোঁ-সোঁ করে চলতে-চলতেই চকা বলে উঠল—

জোরে চলায় নাই কোনো দায়,

আস্তে গেলেই হাঁপ লেগে যায়!

অমনি সব হাঁস একসঙ্গে বলে উঠল—"চলে চল, চলে চল, ভাই, চলে চল।"

চকার কথা-মাফিক খোঁড়া হাঁস জোরে চলতে চেষ্টা করতে দুগুণ হাঁপিয়ে পড়ল; আর সে আস্তে-আস্তে ক্রমে মাঠের ধারে-ধারে নারকোল গাছের প্রায় মাথা পর্যন্ত নেমে পড়বার মতো হল। তখন সেথো হাঁসরা আবার ডাক দিলে—"চকা-নিকোবর—চকা-চকা-চকা!"

এবার চকা গরম হয়ে বললে—“ক্যেঁন্ কর ভ্যেঁন ভ্যেঁন?”

সেথোরা বলে উঠল—“খোঁড়া হাঁস তলিয়ে যায়!”

চকা একবার চেয়েও দেখলে না, যেমন বেগে চলেছিল তেমনি পুরো দমে যেতে-যেতে বললে—“বল ওকে হাল্কা হাওয়ায় উঠে আসতে।”

নিচের বাতাস ঠেলা মুশকিল,

ডানা নেড়ে-নেড়ে লাগে ঘাড়ে খিল।

উপর বাতাস পাতলা ভারি,

এক ঝাপটে বিশ হাত মারি।

খোঁড়া হাঁস চকার কথায় উপরে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু এবার বাতাস ঠেলে উঠতে বেচারার দম নিকলে যাবার যোগাড় হল।

আবার সেথোরা ডাক দিলে—“চকা! চকা!”

“কেনে? চলতে দিবে না নাকি!” —বলে চকা গোঁ হয়ে উড়ে চলল।

সেথোরা বললে—“খোঁড়া-বেচারার প্রাণসংশয়!”

চকা রেগে উত্তর দিলে—

উড়তে না পারে ঘরে যাক,

খাক-দাক বসে থাক।

কে বলেছে উড়তে ওরে,

ভিড়তে দলে রঙ্গ করে?

খোঁড়া হাঁসের জানতে বাকি রইল না যে বুনো হাঁসরা কেবল তামাশা দেখবার জন্যে তাকে এতটা সঙ্গে এনেছে—মানস-সরোবরে নিয়ে যেতে নয়। আঃ কি আপশোষ! ডানা যে তার আর চলছে না! না হলে খোঁড়া হাঁসও যে উড়তে পারে, সেটা একবার বুনো হাঁসদের সে দেখিয়ে দিত। তা ছাড়া এই চকা-নিকোবর—এমন হাঁস নেই যে একে জানে না; এই একশো বছরের বুড়ো হাঁস, যার সঙ্গে পয়লানম্বর হাঁসও উড়ে পেরে ওঠে না, পড়বি তো পড় তারি পাল্লায়! যে চকা পোষা হাঁসকে হাঁসের মধ্যেই ধরে না, লজ্জা পেতে হল কিনা তারি সামনে! এ দুঃখু সে রাখবে কোথায়!

খোঁড়া সবার পিছনে ভাবতে-ভাবতে চলল—বাড়ি ফিরবে, কি, প্রাণ যায় তবু সমানে বুনো হাঁসের সঙ্গে চলে সে দেখিয়ে দেবে যে সেও জানে উড়তে! রিদয় এই সময় খোঁড়াকে বললে—“সুবচনীর কৃপায় এতদূর এসেছ, আর কেন? এইবার ফের। এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে শেষে দম-ফেটে মরবে নাকি! আমি তো ওদের মতলব ভালো বুঝছিনে!”

রিদয় কিছু না বললে, হয়তো খোঁড়া আপনা-হতেই বাড়ি-মুখো হত; কিন্তু এই বুড়ো-আংলা, এও ভাবছে তাকে কমজোর! খোঁড়া বিষম রেগে ধমকে উঠল—“ফের কথা কইলে মাটিতে ঝেড়ে-ফেলে চলে যাব।” বলেই রেগে ডানা আপসে খোড়া এমনি তেজে উড়ে চলল যে বুনো হাঁসরাও একেবারে অবাক হয়ে গেল। রাগের মুখে গোঁ-ভরে যেমন তেজে খোঁড়া চলেছিল, রাগ পড়লে সে তেজ থাকত কিনা সন্দেহ। কিন্তু ঠিক সেই সময় সূর্য পাটে বসতে চললেন। দেখতে-দেখতে বেলা পড়ে এল। অমনি হাঁসরা সবাই জমি-মুখো হয়ে ঝুপ-ঝাপ আকাশ থেকে চাঁদপুরের সামনে মেঘনার মাঝে বাগদী চরে নেমে পড়ল। চরে উড়ে বসতেই রিদয় হাঁসের পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ল।

তখন চরের উপর থেকে সবেমাত্র জল সরে গেছে, ভিজে কাদা তখনো কালো প্যাচ-প্যাচ করছে—মাঝে-মাঝে ডোবায় এখনো জল বেধে আছে। এবড়ো-খেবড়ো ভাঙা-চোরা পিছল চর; খানা, ডোবা, নালা, এখানে-ওখানে, এরি উপরে সন্ধ্যের হিম হাওয়া বইছে। রিদয়ের গা কাঁটা দিয়ে উঠল শীতে। নদীর কিনারায় যেদিকে হাঁসরা নেমেছে, সেদিকে খানিক জঙ্গল অন্ধকারে কালো দেখাচ্ছে। জঙ্গল ছাড়িয়ে খোলা মাঠ, সেদিকে মানুষ কি গরু কিছুই নেই। চারদিক সুনসান! মেঘনার মাঝে লাল ফানুসের মতো রাঙা সুয্যি পশ্চিম-আকাশে রামধনুকের রঙ টেনে দিয়ে আস্তে-আস্তে জলে ডুবছে।

রিদয়ের মনে হল সে যেন কোথায় কতদূরে মানুষের বসতি ছেড়ে পৃথিবীর শেষে এসে পড়ছে! বেচারা সমস্ত-দিন খেতে পায়নি। তার কেবলি কান্না আসতে লাগল। এই একলা চরে কেউ কোথাও নেই—কোথায় খায়, কোথায় যায়? আর যদি বাঘ আসে, কে তাকে বাঁচায়? আর যদি বিষ্টি আসে, কোথায় সে মাথা গুঁজবে? কোথা রইলেন বাপ-মা, কোথা রইল ঘর-বাড়ি! সূর্য লুকিয়ে গেছেন; জল থেকে উঠছে কুয়াশা; আকাশ থেকে নামছে অন্ধকার; চারদিকে ঘনিয়ে আসছে ভয়! ওধারে বনের তলাটা যেন নিঝুম হয়ে আসছে! ঝিমঝিম সেখানে ঝিঁঝিঁ ডাকছে, আর লতায়-পাতায় খুসখাস শব্দ উঠছে।

রিদয়ের মনে আকাশে উঠে যে ফুর্তিটা হয়েছিল, এখানে নেমে সেটুকু একবারে নিভে গেল। এখন এই হাঁসগুলো ছাড়া সঙ্গী আর কেউ নেই। রিদয় দেখলে সুবচনীর হাঁস একেবারে কাবু হয়ে পড়েছে। বেচারা মাটিতে পা দিয়েই শুয়ে পড়েছে! কাদার উপর গলা বাড়িয়ে দুই-চোখ বুজে সে কেবলি জোরে-জোরে শ্বাস টানছে—যেন আধ-মরা!

রিদয় তার সঙ্গের সাথী খোঁড়া হাঁসকে বললে—"একটু জল খেয়ে নাও —এই তো দু'পা গেলেই নদী!" কিন্তু খোঁড়া সাড়া-শব্দ দিলে না। রিদয় আর এখন দুষ্টু নেই। এই খোঁড়া হাঁস এখন আর শুধু হাঁস নয়—তার বন্ধু, সাথী সবই। সে আস্তে-আস্তে তার গলাটি ধরে উঠিয়ে জলের ধারে নিয়ে চলল। রিদয় ছোট, হাঁস বড়; কিন্তু প্রাণপণে সে হাঁসকে টেনে নিয়ে জলের কাছে নামিয়ে দিলে। হাঁস জলে কাদায় খানিক মুখ ডুবিয়ে চুক-চুক-করে জল খেয়ে নিয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে জলে নেমে শর-বেণার ঝাড় ঠেলে সাঁতরে-সাঁতরে খাবারের সন্ধান করতে লাগল।

বুনো হাঁসগুলো নেমেই জলে গিয়ে পড়েছিল; খোঁড়া হাঁসের কোনো খবরই নেয়নি; দিব্যি চান করে ডানা ঝেড়ে গুগলী-শামুক শাক-পাত খেয়ে বেড়াচ্ছে। রিদয়ের হাঁস জলে নেমেই সুবচনীর কৃপায় একটা পাঁকালমাছ পেয়ে গেল। সে সেইটে মুখে নিয়ে ডাঙায় এসে রিদয়ের কাছে ফেলে দিয়ে বললে—"এই নাও, মাছটা তোমায় দিলুম। আমার যে উপকার করেছ, তা চিরদিন মনে থাকবে। খেয়ে নাও মাছটা।"

হাঁসের কাছে দুটো মিষ্টি কথা পেয়ে রিদয় একেবারে গলে গেল। তার মনে হল সেই খোঁড়া-হাঁসের গলা ধরে তার দু'ঠোঁটে দুটো চুমু খায়। রিদয় কাদা থেকে মাছটি তুলে একবার ভাবলে—রাঁধি কিসে? অমনি মনে পড়ল—সে যে এখন আর মানুষ নেই, যক্ হয়েছে; হয়তো কাঁচা মাছ খেতে পারবে। রিদয়ের ট্যাঁকে এটা-ওটা কাটতে একটা ছুরি থাকত; সে সেইটে টেনে বার করে মাছটা কুটতে বসল। ছুরিটা এখন একটা খড়কে-কাঠির মতো ছোটো হয়ে গেছে, কিন্তু তাতেই কাজ চলে গেল। মাছটা ছোট-ছোট করে বানিয়ে কতক-কতক হাঁসকে খাইয়ে দিয়ে, নিজে খেতে বসল। তার যকের মুখে কাঁচা মাছ নেহাত মন্দ লাগল না। রিদয়ের খাওয়া হলে খোঁড়া তাকে চুপি-চুপি বললে যে চক-নিকোবরের দল পোষা হাঁসকে হাঁসের মধ্যে গণ্য করে না। রিদয় চুপি-চুপি বললে—"তা তো দেখতে পাচ্ছি।"

খোঁড়া হাঁস গলা-ফুলিয়ে বললে—"মজা হয়, যদি একবার এদের সঙ্গে সমানে আমিও মানস-সরোবর পর্যন্ত উড়ে যেতে পারি। পোষা হাঁস কি করতে পারে তবে ওরা টের পায়।"

"তা তো বটেই!" বলে রিদয় চুপ করলে।

খোঁড়া বলে চলল—"আমার মনে হয় একলা আমি অতটা যেতে পারি কি না! কিন্তু তুমি যদি সঙ্গে চল, তবে আমি সাহস করি।"

রিদয় ভেবেছিল এখান থেকেই সে বাড়ি ফিরবে। কিন্তু হাঁসের ইচ্ছে শুনে সে একটু তা-না-না করে

বললে—"দ্যাখো, আমার সঙ্গে তোমার বনবে কি? আমি তোমাকে আগে কত জালাতন করেচি।" কিন্তু রিদয় দেখলে হাঁস আগের কথা ভুলে গেছে, রিদয় যে তার প্রাণ বাচিয়েছে—জল খাইয়ে যত্ন করে, সেই কথাই সে খোঁড়া হাঁস মনে রেখেছে। একবার বাপ-মায়ের কথা তুলে রিদয় হাঁসকে বাড়ি ফেরাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু হাঁস বললে—"কোনো ভাবনা নেই, আসছে-শীতে তোমায় আমি ঠিক বাড়িতে পৌছে দেব। তোমাকে ঘরের দরজায় নামিয়ে দিয়ে তবে আমার ছুটি। তার মধ্যে তোমায় একলা ছেড়ে আমি কোথাও নড়ব না—প্রতিজ্ঞা করছি!"

রিদয় ভাবছে—মন্দ না! এই যক্ হয়ে মা-বাপের কাছে এখন না যাওয়াই ভালো! কি জানি, মানস-সরোবর থেকে হয়তো কৈলাসেও গণেশের সন্ধান করা যেতে পারবে। এই ভেবে রিদয় খোঁড়া হাঁসকে জবাব দেবে এমন সময় পিছনে অনেকগুলা ডানার ঝটাপট শোনা গেল। এককুড়ি বুনো হাঁস একসঙ্গে জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে গায়ের জল ঝাড়ছে। তারপরে মাঝে চকা-নিকোবরকে রেখে সারিবন্দী সব হাঁস তাদের দিকে এগিয়ে আস্তে লাগল। খোঁড়া হাঁস বুনো হাঁসদের চেহারা দেখে একটু ভয় খেলে। সে ভেবেছিল হাঁস-মাত্রে পোষা হাঁসের মতো দেখতে; আর ধরন-ধারণও সেই রকম। কিন্তু এখন দেখলে বুনো হাঁসগুলো বেঁটে-খাটো গাঁট্টা-গোঁট্টা-কাটখোট্টা-গোছের। এদের রঙ তার মতো শাদা নয়, কিন্তু ধুলো-বালির মতো ময়লা, পালক এখানে খয়েরী, ওখানে খাকির ছোপ। আর তাদের চোখ দেখলে ভয় হয়—হলুদবর্ণ—যেন গুলের আগুন জ্বলছে! খোঁড়া বরাবর দেখে এসেছে হাঁস চলে হেলতে-দুলতে—পায়ে-পায়ে; কিন্তু এরা চলছে খটমট চটপট-যেন ছুটে বেড়াচ্ছে। আর এদের পাগুলো বিশ্রী—চ্যাটালো, কেটো-কেটো, ফটা-চটা—হতকুৎসিত! দেখলেই বোঝা যায় যেখানে-সেখানে শুধু-পায়ে এরা ছুটে বেড়ায়—জল কাদা কিছুই বাছে না। তাদের ডানার পালক, গাঁয়ের পালক, ল্যাজের পালকগুলো পরিষ্কার ঝকঝক করছে বটে কিন্তু ধরণ-ধারণ দেখলে বোঝা যায় এগুলো একেবারে বুনো আর জংলি! খোঁড়া তাড়াতাড়ি রিদয়কে সাবধান করে দিলে—যেন সে কে, কি বৃত্তান্ত, এসব কথা বুনো হাঁসদের না বলে। তার পর সে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এগিয়ে গেল। চকা-নিকোবর, খোঁড়াহাঁস আর বুনোহাঁসদের মধ্যে খানিক্ষণ ঘাড়-নেড়ে নমস্কার প্রতি-নমস্কার চলল। তারপর চকা শুধোলে—"এখন বল তো, তোমরা কে? কোন জাতের পাখি?"

খোঁড়া আস্তে-আস্তে বললে—"কি আর পরিচয় দেব? গেল-বছর ফাগুন মাসে হরিংঘাটায় আমি ডিম-ভেঙে বার হই। জন্মাবধি পা-টি খোঁড়া। এই শীতে আমতলির হাটে আমি বিকোতে আসি; সেখান থেকে রিদয়ের বাপ আমায় সাত-সিকেতে কিনে আনে; তারপর তোমাদের দলে ভিড়েছি।"

চকা-নিকোবর নাক তুলে বললে—"তুমি তবে নেহাত সাধারণ-হাঁস দেখছি! খেতাব, মানসম্ভ্রম, বোল্‌বোলা—কিছুই নেই! কোন সাহসে আমাদের দলে আসতে চাও শুনি?"

খোঁড়া হাঁস খোঁড়া পাটি নাচিয়ে বললে—"আমি দেখাতে চাই যে সাধারণ হাঁসও কাজের হতে পারে।"

চকা হেসে বললে—"সত্যি নাকি? কই, দেখাও দেখি কেমন কাজের কাজী তুমি?"

এক হাঁস অমনি বললে—"ওড়ার কাজে কেমন যে তুমি মজবুত তাতো দেখিয়েচ!"

অন্যে বললে—"হয়তো তুমি সাঁতারে পাকা।"

খোঁড়া ঘাড়-নেড়ে বললে—"না, আমি সাঁতারু মোটেই নয়। আমি বর্ষার সময় নালাগুলো এপার-ওপার করতে পারি, তার বেশি নয়।" খোঁড়া হাস ভাবছিল, চকা তো তাকে আমতলিতে ফিরে পাঠাবেই স্থির করেছে, তবে কেন মিছে-কথা বলা? পষ্ট জবাব দেওয়াই ভালো—যা থাকে কপালে!

চকা শুধোলে—"সাতার জানো না, তবে দৌড়তে মজবুত বোধ হয়?" বলেই চকা একবার তার খোঁড়া পায়ের দিকে চেয়ে চোখ মটকালে।

খোঁড়া হাস গম্ভীর হয়ে বললে—"রাজহাঁস কোনো দিন ছুটে চলে না, তাই ছোটা আমার অভ্যেসই হয়নি।" বলে সে খোঁড়া-পা আরো খুঁড়িয়ে রাজহাঁস কেমন চলে একবার দেখিয়ে দিলে। তার মনে হচ্ছিল এইবার চকা বললে বুঝি—"তোমায় আমাদের দরকার নেই, ঘরে যাও।" কিন্তু ঠিক তার উল্টোটা হল। চক-নিকোবর দু'চারবার ঘাড়-নেড়ে বলল— "তুমি তো বেশ সাফ-সাফ জবাব দিলে—একটুও ভয় না

করে! ভালো, ভালো, তোমার সাহস আছে—সময়ে লায়েক হতে পারবে—'বুকের পাটা শক্ত, সকল কাজে পোক্ত'। দু'দিন এদলে থাক, দেখি তোমার হিম্মৎ কতটা, তারপর যা হয় বিবেচনা করা যাবে। কি বল?"

খোঁড়া হাঁস মাথা নেড়ে বললে—"আমি তো তাই চাই। এতেই আমি খুশি!"

এইবার চকা-নিকোবর বুড়ো-আংলা রিদয়ের দিকে ঠোঁট বাড়িয়ে বললে—"একি, এ কোন জানোয়ার? ভারি তো অদ্ভুত।"

খোঁড়া হাঁস তাড়াতাড়ি বললে—"এটি আমার দেশের লোক, হাঁস চরাবার কাজ করে, সঙ্গে থাকলে কাজে লাগতে পারে।"

চকা নাক তুলে উত্তর করলে—"বুনো হাঁসের কোনে কাজে লাগবে না।—পোষা হাঁসের কাজে লাগবে বটে! ওর নাম কি?"

মানুষের নাম বললে পাছে বুনো হাঁসরা ভয় খায়, সেইজন্যে খোঁড়া হাঁস অনেক ভেবে বললে—"ওর নাম অনেকগুলো। আমরা ওকে ডাকি বুড়ো-আংলা বলে। আঃ, বড় ঘুম পাচ্ছে।" বলেই খোঁড়া দুবার হাই তুলে চোখ বুজলে; পাছে চকা আর-কিছু প্রশ্ন করে তাই খোঁড়া আগে থাকতেই সাবধান হচ্ছে—"মাগো, চোখ আপনা-হতেই ঢুলে আসছে! চল্‌রে বুড়ো-আংলা, ঘুমোবি চল।"

চকা-নিকোবর বড় পাকা হাঁস; বুড়ো হয়ে তার মাথা থেকে ল্যাজের পালক পর্যন্ত রুপোর মতো শাদা হয়ে গেছে; মাথাটা যেন চূনের হাঁড়ি; পা-দুটো যেন চ্যালা-কাঠ—বাঁকা, ফাটা-চটা; ডানা-দুটো যেন দুখানা ঝরঝরে বাঁশের কুলো; ঠোট ভোঁতা; গলা ছিনে-পড়,; কিন্তু চোখ এখনো জোয়ান-হাঁসের চেয়েও ঝকঝকে—যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে! চকা দেখলে খোঁড়া পাশ-কাটাবার চেষ্টায় আছে, সে এগিয়ে এসে বুক-ফুলিয়ে খোঁড়াকে বললে—"আমি কে, জানো তো? আমার নাম—চকা-নিকোবর! আর এই আমার ডাইনের হাঁস দেখেছ, ইনি আমার ডান-হাত বললেও চলে, এঁর নাম পাঁপড়া নান্‌কৌড়ি! আর এই আমার বাঁ-হাত, এঁর নাম নেড়োল-কাটচাল। তারপর ডাইনে হলেন লালসেরা আণ্ডামানি; বাঁয়ে হলেন—চোক-ধলা ডানকানি। তারপরে পাটাবুকো হামস্ত্রি, মারগুই চাপড়া, তিরশুলী আকায়ব, সনদ্বীপের বাঙাল, ধনমানিকের কাওয়াজি, রাবণাবাদের রাজহাঁস, রায়-মঙ্গলার ঘেংরাল, চব্বিশ-পরগনার সরাল। আরো ডাইনে-বাঁয়ে দেখ—লুসাই, তিব্বতি, তাতারি—এমনি সব বড়-বড় খেতাবি হাঁস—কেতাবে যাদের নাম উঠেছে! আমরা কি যার-তার সঙ্গে আলাপ করি, না যাকে-তাকে দলে ভিড়তে দিই? আমাদের সঙ্গে যদি ওঠা-বসা করতে চাও তো পষ্ট করে ওই বুড়ো-আংলাটির গাঁই-গোত্তর পদবী-উপাধি বল, নয় তো নিজের পথ দেখ!"

চকার দেমাক দেখে রিদয় আর চুপ করে থাকতে পারলে না; সে বুক-ফুলিয়ে এগিয়ে এসে বললে—"আমার নাম ছিল—ছিযুক্ত রিদয়নাথ পুততুণ্ড, ফুলুরী গাঁই, কাশ্যপ গোত্র—পুষ্যিপুত্র; ডিহি বাখরগঞ্জ, মোকাম আমতলি—হাসপুকুর, তেঁতুলতলা। জাতে আমি মানুষ ছিলেম, সকলে এখন—" আর বলতে হল না; মানুষ শুনেই চকা-নিকোবরের দল দশহাত পিছিয়ে গিয়ে গলা বাড়িয়ে খ্যাঁক-খ্যাঁক্ করে বললে—"যা ভেবেছি তাই! সরে পড়। মানুষ আমরা দলে নিইনে। ভারি বজ্জাত তারা!"

খোঁড়া হাঁস আমতা-আমতা-করে বললে—"এইটুকু মানুষ, ওকে আবার ভয় কি? কাল ওতো আপনিই বাড়ি চলে যাবে; আজ রাতটা এখানে থাক না! এইটুকু টিকটিকির মতো ওকে এই অন্ধকারে শেয়াল-কুকুরের মুখে ছেড়ে দেওয়া তো চলে না। তা ছাড়া ও আর এখন মানুষ নেই—যক হয়ে গেছে!"

চকা 'যক্' শুনে সাহস পেয়ে এগিয়ে এলে বললে—"বাপু, মানুষ-জাত খারাপ, বরাবর দেখে এসেছি। ওদের বিশ্বাস নেই। তবে তুমি যদি জামিন থাক, তবে রাতের মতো ওকে আমরা থাকতে দিই। এই হিমে চড়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে ও যদি অসুখে পড়ে, তার দায়ী আমরা হব না—এইবেলা বুঝে দেখ!"

খোঁড়া হাঁস পিছবার পাত্র নয় ; সে বললে—"সে ভয় নেই। চড়ায় এক রাত কেন, সাত রাত কাটালেও ওর কিছু হবে না। এমন সৎসঙ্গ, ভালো জায়গা বনে আর পাবে কোথা? ওর বড় জোর-কপাল

যে চকা-নিকোবরের সঙ্গে এক-চরে শুতে পেয়েছে চকার বাছা বাগদী-চর; এতে শুয়ে আরাম কর।" বলে খোঁড়া রিদয়কে চোখ টিপলে।

চকা খোশমোদে খুশি হয়ে বললে—"তাহলে কাল কিন্তু ওর বাড়ি ফের চাই—কেমন?"

খোঁড়া বললে—"ওর সঙ্গে তাহলে আমাকেও ফিরতে হয়। আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি—ওকে ছাড়ব না!"

চকা-নিকোবর উত্তর দিলে—"তুমি যেমন বোঝো। ইচ্ছে হয় আমাদের সঙ্গে থাকতে পার, ইচ্ছে হয় ফিরতে পার।" এই বলে চকা চরের মধ্যিখানে উড়ে বসল।

একে-একে বুনো হাঁস চরে গিয়ে ডানায় মুখ গুজে শুয়ে পড়েছে। খোঁড়া হাঁস রিদয়ের কানে-কানে বললে—"চরে বড় হিম; যত পার শুকনো ঘাস কুড়িয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে এস।" রিদয় দু বোঝা শুকনো কুটো-কাটা হাঁসের পিঠে দিয়ে চেপে বসল। হাঁস তাকে চরের একটা গর্তে নামিয়ে বললে—"ঘাসগুলো বালির উপর বিছিয়ে দাও; আমি ওর উপর বসি, তুমি আমার ডানার মধ্যে ঢুকে পড়, আর ঠাণ্ডা লাগবে না।" রিদয়কে ডানার মধ্যে নিয়ে সুবচনীর খোঁড়া হাঁস—"এই আমায় তুমি আরামে রাখ, আমি তোমায় গরমে রাখি" —বলে খড়ের উপরে আরামে বসে ঘুম দিতে লাগল। রিদয়ের মনে হল যেন সে পালকের তোশকে শুয়েছে। সেও একটিবার হাই তুলেই চোখ বুজলে।

শৃগাল



মেঘনার মোহানায় চর যে কখন কোথায় পড়ে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আজ যেখানে জল, কাল সেখানে দেখা গেল চড়া পড়ে বালি ধূ-ধূ করছে; কাল যেখানে দেখেছি চরে উলু-ঘাস, বালু-হাঁস; বছর ফিরতে সেখানে দেখলেম চরও নেই, হাঁসও নেই—অগাধ জল থৈথৈ করছে! এক-রাতের মধ্যে হয়তো নদীর স্রোত ফিরে গেল—জলের জায়গায় উঠল বালি, বালির জায়গায় চলল জল।

বাগদী-চরে হাঁসেরা যখন উড়ে বসল, তখন চরের চারদিকে জল—ডাঙা থেকে না সাঁতরে চরে আসা মুশকিল। অপার মেঘনার বুকে একটুকরো ময়লা গামছার মতো ভাসছিল চরটি, কিন্তু রাত হতেই জল ক্রমে সরতে লাগল, আর দেখতে-দেখতে সরু এক-টুকরো চড়া, ডাঙা থেকে বাগদীচর পর্যন্ত, একটি সাঁকোর মতো দেখা দিলে।

চাঁদপুরের জঙ্গলে বসে খেঁকশেয়ালী হাঁসের দলের উপরে নজর রেখেছিল; কিন্তু চকা-নিকোবরকে সে চেনে; এমনি বেছে-বেছে নিরাপদ জায়গায় চকা তার দল নিয়ে রাত কাটাত যে এপর্যন্ত তার দলের একটি হাঁস শিয়ালে ধরতে পারেনি। মেঘনার পুব-তীরের জঙ্গল ভেঙে রাতের বেলায় খেঁকশেয়ালী শিকারে বেরিয়েছে, এমন সময় জলের বুকে কুমীরের পিঠের মতো সরু সেই চরটির দিকে চোখ পড়ল। এক লাফ দিয়ে সে চর ডিঙিয়ে পায়ে-পায়ে অগ্রসর হল। খেঁকশেয়ালী প্রায় হাঁসের দলে এসে পড়েছে, এমন সময় ছপ-করে একটা ডোবার জলে তার পা পড়ল; আমনি চকা চমকে উঠে ডাক দিলে—"কেও?" আর সব হাঁস ডানা ঝেড়ে উড়ে পড়তে আরম্ভ করলে; সেই অবসরে তীরের মতো ছুটে গিয়ে শেয়াল লুসাই-হাঁসের ডানা কামড়ে ধরে হিড়-হিড় করে সেটাকে ডাঙার দিকে নিয়ে চলল।

সব হাঁসের সঙ্গে ভয় পেয়ে খোড়া হাঁসও ডানা ছাড়িয়ে আকাশে উঠল; কেবল রিদয় হাঁসের ডানা থেকে ঝুপ-করে মাটিতে পড়ে চোখ-রগড়ে চেয়ে দেখলে অন্ধকারে সে একা, আর দূরে একটা কুকুর হাঁস ধরে পালাচ্ছে। অমনি রিদয় হাঁসটা কেড়ে নিতে শেয়ালের সঙ্গে ছুটল। মাথার উপর থেকে খোঁড়া হাঁস একবার হাক দিলে—"দেখে চল!" কিন্তু রিদয় তখন হৈ-হৈ করে ছুটেছে। রিদয়ের গলা পেয়ে লুসাই

কতকটা সাহস পেলে, কিন্তু বুড়ো-অঙুলের মতো ছেলে কেমন করে শেয়ালের মুখ থেকে তাকে বাঁচাবে, এটা তার বুদ্ধিতে এল না। এত দুঃখেও লুসায়ের হাসি এল। সে প্যাঁক-প্যাঁক করে হাসতে-হাসতে চলল।

মাথার উপরে খোঁড়া হাঁস রিদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে; তার ভয়—পাছে রিদয় খানায়-ডোবায় পড়ে হাত-পা ভাঙে। কিন্তু যক্ হয়ে অবধি খুব অন্ধকার রাতেও যকের মতো রিদয় দেখতে পাচ্ছে। খানা-খন্দ লাফিয়ে দিনের বেলার মতো রিদয় সহজে ছুটেছে আর চেঁচাচ্ছে—"ছেড়ে দে বলছি, না হলে এক ইট মেরে পা খোঁড়া করে দেব!" কে তার কথা শোনে? শেয়াল এক লাফে চড়া ছেড়ে পারে উঠে দৌড়ে চলল। রিদয়ও চলেছে হাঁকতে-হাঁকতে—"মড়াখেকো-কুকুর কোথাকার! ছাড় বলছি, না হলে মজা দেখাব।"

চাঁদপুরের খেঁকশেয়াল যার নাম, আসামের জঙ্গলে হেন পাখি নেই যে তাকে জানে না। সে শহরে গিয়ে কতবার মুরগি, হাঁস ধরে এনেছে। তাকে 'মড়াখেকো-কুকুর' বলে এমন সাহস কার? শেয়াল একটু থেমে যেমন ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছে, অমনি রিদয় গিয়ে তার ল্যাজ চেপে পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিলে। মানুষটি বুড়ো-আংলা, তার কিলটি কত বড়ই বা? শেয়ালের পিঠে একটা যেন বেদানা-বিচি পড়ল! কিন্তু মানুষের মতো গলার স্বর শুনে শেয়াল সত্যি ভয় পেলে; সে ল্যাজ তুলে বনের মধ্য দিয়ে পালিয়ে চলল; আর রিদয় তার ল্যাজ ধরে টিকটিকির মতো ঝুলতে-ঝুলতে চলল—উলু-ঘাসের মধ্যে দিয়ে গা-ঘেঁষড়ে। কাঁকড়ার মতো ল্যাজে কি কামড়ে রয়েছে, সেটা দেখবার শেয়ালের অবসর ছিল না, সে একেবারে নিজের গর্তর কাছে এসে দাড়িয়ে, মুখ থেকে হাঁসটা নামিয়ে, সেটার বুকে পা দিয়ে দাড়াল, তখন তার চোখ পড়ল ল্যাজে-গাঁথা বুড়ো-আংলার দিকে! এই টিকটিকির মতো ছেলেটা-ইনি চাঁদপুরী শেয়ালকে জব্দ করবেন, ভেবে শেয়াল ফ্যাক করে মুখ-ভেংচে হেসে বলল—"এইবার তোমার মনিবকে খবর দাওগে চাঁদপুরের শেয়াল হাঁস খেয়েছে।"

ছুঁচোলো-মুখ, নাটা-চোখ দেখে এতক্ষণে রিদয় বুঝলে এটা শেয়াল। কিন্তু শেয়াল তাকে ভেংচেছে, এর শোধ সে দেবেই-দেবে! রিদয় আরো শক্ত করে তার ল্যাজ চেপে, দুই পায়ে একটা গাছ আঁকড়ে, যেমন শেয়াল হাঁ করে হাঁসটার গলা কাটতে গেছে অমনি পিছনে এক টান দিয়ে, হাঁস থেকে শেয়ালকে দু-হাত তফাতে টেনে নিয়েছে! আর সেই ফাঁকে লুসাই হাঁসও ভাঙা ডানা ঝাপটাতে-ঝাপটাতে উড়ে পালিয়েছে।

"হাঁস যাক, আজ তোকে খাব!" —বলে খেঁকশেয়ালী দাঁত-খিচিয়ে রিদয়কে ধরবার জন্যে কেবলি নিজের ল্যাজটার সঙ্গে ঘুরতে লাগল। রিদয়ও ল্যাজ আঁকড়ে চরকি-বাজির মতো শেয়ালের সঙ্গে ঘুরতে থাকল, আর বলতে লাগল—"ধর দেখি মড়াখেকো কুকুর!"

বনের মধ্যে শেয়ালে-মানুষে চড়ক-বাজি এমনতর কেউ কোনোদিন দেখেনি। প্যাঁচা, চামচিকে, এমন কি দিনের পাখিরাও তামাশা দেখতে বার হল। কিন্তু রিদয় দেখলে তামাশা ক্রমে শক্ত হয়ে উঠছে—সে নিজে শেয়ালের ল্যাজ ছাড়তে চাইলেও, শেয়াল তাকে সহজে ছাড়ে কি না সন্দেহ! খেঁকশেয়ালী পাকা শিকারী; তার গায়ের শক্তিও যেমন, বুদ্ধিও তেমনি, সাহসও কম নয়। রিদয় বুঝলে ঘুরে-ঘুরে সে নিজে যেমনি হাঁপিয়ে পড়বে অমনি টুপ-করে তাকে ধরবে শেয়াল! রিদয় একবার চারদিক চেয়ে দেখলে, হাতের কাছে কোনে বড় গাছ আছে কি না। কাছেই একটা সরু ঝাউ-গাছ বন ঠেলে আকাশে সোজা উঠেছে, ঘুরতে-ঘুরতে রিদয় সেইদিকে এগিয়ে গেল, তারপর হঠাৎ একসময় শেয়ালের ল্যাজ ছেড়ে একেবারে ঝাউ-গাছটার আগ-ডালে উঠে পড়ল। শেয়াল তখনো নিজের ল্যাজ কামড়াতে বো-বো লাঠিমের মতো ঘুরছে। রিদয় গাছের উপর থেকে চেচিয়ে বললে :

তাকুড়-তাকুড় তাকা!

যাচ্ছে শেয়াল ঢাকা!

থাকে-থাকে-থাকে

হুক্কাহুয়া ডাকে!

চাঁদপুরের কাঁকড়া-বুড়ি

কামড়েছে তার নাকে!

শেয়াল দেখলে শিকার তাকে ঠকিয়ে পালাল! সে গাছের তলায় হাঁ-করে বসে রিদয়ের দিকে চেয়ে বললে—"রইলুম এইখানে বসে, কতক্ষণে নেমে আসিস দেখি! তোকে না খেয়ে নড়ছিনে!" এক-ঘণ্টা গেল, দু-ঘণ্টা গেল, শেয়াল আর নড়ে না। ঝাউ-গাছের সরু ডালে পা ঝুলিয়ে শীতের রাতে জেগে বসে থাকা যে কি কষ্ট আজ রিদয় বুঝলে। শীতে তার হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে, চোখ ঢুলে পড়ছে, কিন্তু ঘুমোবার যে নেই—পড়ে যাবার ভয়ে। আর বনের মধ্যে অন্ধকারই বা কত! দুহাত তফাতে নজর চলে না—মিশ কালো ঘুটঘুটে চারদিক! মনে হল যেন গাছ-পালা সব শীতে কালো পাথরের মতো পাষাণ হয়ে গেছে! একটি পাখি ডাকছে না, একটি পাতা নড়ছে না—সব নিথর নিঝুম! রিদয়ের মনে হচ্ছে রাত যেন ফুরোতে চায় না!—রিদয় আর না ঘুমিয়ে থাকতে পারে না! এই সময় ভোরের কনকনে বাতাস বইল, আর দেখতে-দেখতে ভুসো-কালির মতো রাতের রঙ ক্রমে ফিকে হতে-হতে মিশি থেকে রাঙা, রাঙা থেকে রুপোলী, রুপোলী থেকে সোনালী হয়ে উঠল। তারপর বনের ওপারে সূর্য উঠলেন। বেলায় উঠত, কাজেই সূর্যকে চিরকাল রিদয় দেখে এসেছে কাঁচা-সোনার মতো হলুদ-বর্ণ; সূর্য যে ক্ষেপা মোষের চোখের মতো এমন লাল টকটকে, তা তার জ্ঞান ছিল না; তার ঠিক মনে হল কে যেন রাত্তিরের কাণ্ডকারখানা শুনে রেগে তার দিকে চাচ্ছেন!

তারপর গাছের ফাঁকে-ফাঁকে সকালের আলো উঁকি মারতে লাগল—বনের গাছ-পালা, জীব-জন্তু রাতের আড়ালে আবডালে অন্ধকারে বসে কি কাণ্ড করেছে, তারি খোঁজ নিতে লাগল। বনের তলাকার চোরকাঁটা, শেয়াল-কাঁটা, কাটি-কুটি, কাঁটা-খোঁচা, যা-কিছু সব যেন আলোর ধমকে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। ক্রমে মেঘে-মেঘে আলো পড়ল-রঙ ধরল; গাছের পাতা, ঘাসের শিষ, ফোটা-ফুলের পাপড়ি, তার উপরে শিশিরের ফোঁটা—সবই আলোতে ঝলক দিতে থাকল! যেন সবাই সিঁদুর পরে স্যাটিনের কাপড়ে সেজেছে! ক্রমে চারদিক আলোতে আলোময় হয়ে উঠল; অন্ধকারের ভয় দেখতে-দেখতে কোথায় পালাল; আর অমনি কত পাখি, কত জীব-জন্তুই না বনে ছুটোছুটি আরম্ভ করলে! লাল-টুপি-মাথায় কাঠঠোকরা ঠকাস-ঠকাস গাছের ডালে ঘা দিতে বসে গেল, কাঠবেরালি অমনি খোপ ছেড়ে গাছের তলায় বসে কুটুস-কুটুস বাদাম ছাড়াতে লেগে গেল ; গাং শালিক, গো-শালিক, ছাতারে, গাছের তলায় নেমে শুকনো পাতা উল্টে-উল্টে কিড়িং ফড়িং ধরে-ধরে বেড়াতে লাগল; আগ-ডালে বসে শ্যামা-দোয়েল শিস দিতে আরম্ভ করলে। রিদয়ের মনে হল সূর্য যেন সব পশু-পাখি কীট-পতঙ্গদের জাগিয়ে দিয়ে অভয় দিতে থাকলেন—রাত পালিয়েছে, তোরা ঘর ছেড়ে বার হ, আমি এসেছি, ভয় নেই!

রিদয় শুনলে মেঘনার চরে হাঁসেরা ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি লাগিয়েছে, দল একত্র হচ্ছে। চকা-নিকোবর হাঁকলে—"মানস-সরোবর! ধৌলাগিরি! আও আও আও!" তারপর রিদয় দেখলে তার মাথার উপর দিয়ে নিকোবরের পুরো দল উড়ে চলল—খোড়া হাঁসটি সুদ্ধ! রিদয় তাদের একবার ডাক দিলে, কিন্তু এত উপর দিয়ে হাঁসেরা চলেছে যে তার ডাক শুনলে কি-না বোঝা গেল না—উড়তে-উড়তে আকাশে মিলিয়ে গেল। রিদয় স্থির করলে হাঁসেরা নিশ্চয়ই দেখেছে শেয়ালে তাকে খেয়েছে। সে হতাশ হয়ে আকাশে চেয়ে রইল। কিন্তু এত দুঃখেও সকালের আলো আর বাতাস, সে যেখানটিতে বসে আছে সেই ডালটি সোনার রঙে রাঙিয়ে ঝাউ-পাতার মধ্যে দিয়ে চুপিচুপি তাকে এসে বলতে থাকল—"ভয় কি? দিন হয়েছে—সূর্য উঠেছেন, আমরা থাকতে কিসের ভয়!" ঠিক সেই সময় কমলা-লেবুর রঙের সাজ পরে হলুদবর্ণ যে সূর্য আমতলির মাঠে রোজ-রোজ রিদয়কে দেখা দিতেন, তিনি চাঁদপুরের জঙ্গলের উপরে দেখা দিলেন।

বেলা প্রায় এক প্রহর। রিদয় গাছের উপরে, শেয়াল নিচে বসে আছে, হাঁসের দলেরও কোনো খবর নেই, যে-যার খাবার সন্ধানে বেরিয়ে গেছে। ঠিক যখন বেলা ন'টা, তখন দেখা গেল, বনের মধ্যে দিয়ে একটিমাত্র হাঁস, যেন উড়তেই পারছে না, এই ভাবে আস্তে-আস্তে চলেছে। খেঁকশেয়ালী অমনি কান খাড়া করে হাঁসের দিকে নাক উঠিয়ে পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলল। হাঁসটা শেয়ালকে দেখেও দেখলে না, তার নাকের সামনে দিয়েই উড়ে চলল। হাঁসটাকে ধরবার জন্যে শেয়াল একবার ঝম্ফ দিলে, হাঁস অমনি

ফিক করে হেসে, উড়ে গিয়ে চড়ায় বসল। এর পরেই আর-এক হাঁস ঠিক তেমনি করে আরো-একটু মাটির কাছ দিয়ে উড়ে চলল; শেয়ালটা লাফ দিলে; তার কানের রোঁয়াগুলো হাঁসের পায়ে ঠেকল, কিন্তু ধরতে পারলে না—হাওয়ার মতো হাঁস উড়তে-উড়তে চড়ার দিকে চলে গেল। একটু পরে আর-এক হাঁস—এটা যেন উড়তেই পারছে না—একেবারে মাটির কাছ দিয়ে ঝাউগাছের গা-ঘেঁষে উড়ে চলল। এবারে প্রাণপণে শেয়াল ঝম্ফ দিলে। ধরেছে, এমন সময় হাঁস সোঁ-করে তার দাঁতে পালক বুলিয়ে দিয়ে একেবারে মুখের মধ্যে থেকে পালিয়ে গেল। এবার যে এল, সে এমনি বেকায়দায় লটপট করে উড়ে আসছে যে খেঁকশেয়াল ভাবলে—একে তো ধরেছি! কিন্তু বারবার তিনবার ঠকে শেয়াল বিরক্ত হয়ে উঠেছে, সে হাঁসের দিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে গোঁ হয়ে রইল। যে-পথে আগের তিনটে হাঁস গেছে, এটাও সেই-পথ ধরে ঝাউ-তলায় এসে শেয়ালের এত কাছ দিয়ে চলল যে শেয়াল আর থির থাকতে না পেরে দিয়েছে লাফ এমন জোরে যে তার ল্যাজটা ঠেকল হাঁসের পিঠে। কিন্তু হাঁসও পাকা; সে সাঁ-করে শেয়ালের পেটের নিচে দিয়ে গলে তার ঝাঁটার মতো ল্যাজে ডানার এক থাপ্পড় বসিয়ে হাসতে হাসতে চম্পট দিলে। শেয়ালের আর দম নেবার সময় হল না, ঝপ-ঝপ করে আরো গোটা-পাঁচেক হাঁস নাকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল, একটাকেও সে ধরতে পারলে না—লাফানি-ঝাপানি সার হল! এবারে পর-পর আবার পাঁচটা হাঁস একে একে শেয়ালকে লোভ দেখিয়ে সজোরে তার পিঠে ডানার বাতাস দিয়ে হোঃ-হোঃ করে হাসতে-হাসতে একেবারে তার রগ-ঘেঁষে চলে গেল; কিন্তু শেয়াল না-রাম, না-গঙ্গা—চুপ করে বসে রইল। সে বুঝেছে চকা-নিকোবরের দল কাল রাতে হাঁস নিয়ে যাওয়ার শোধ তুলতে মস্করা লাগিয়েছে।

অনেকক্ষণ আর হাঁসেদের দেখা নেই, শেয়াল ভাবচে তারা গেছে, এমন সময় চকা-নিকোবর দেখা দিলেন। তার সেই পাকা পালক, ছিনে গলা দেখেই শেয়াল তাকে চিনে নিলে। একটা ডানা বেঁকিয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এক-কাৎ হয়ে সে উড়ে এল—একেবারে যেন চলতেই পারে না, এই ভাবে। শেয়াল এবারে লাফ দিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত হাঁসটাকে তাড়িয়ে গেল; কিন্তু হাঁস যেন ধরা দিয়েও ধরা দিলে না; সোজা গিয়ে চরে বসে প্যাঁক-প্যাঁক করে হেসে উঠল। শেয়াল একেবারে লজ্জায় লাল হয়ে জঙ্গলের দিকে ফিরে দেখলে—এবারে চমৎকার ধবধবে মোটা-সোটা রাজহাঁস তার দিকে উড়ে আসছে। বনের অন্ধকারে তার শাদা ডানাদুখানা যেন রুপোর মতো ঝকঝক করছে। এবারে শেয়ালের নোলা সকসক করে উঠল। সে এমন লাফ দিলে যে, ঝাউ-গাছের পাতাগুলো তার গায়ে খোঁচা মারলে, কিন্তু খোড়া রাজহাঁস ধরা পড়ল না—সোজা ঝাউ-গাছ ঘুরে চড়ায় গিয়ে উঠল।

এর পরে আর হাঁসের সাড়া-শব্দ নেই; সব চুপচাপ। শেয়াল ঝাউগাছের দিকে চেয়ে দেখলে, ছেলেটাও সেখান থেকে সরে পড়েছে। শেয়াল ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে চাইছে এমন সময় চড়ার দিক থেকে একে-একে হাঁস সব আগেকার মতো তাকে লোভ দেখিয়ে উড়ে চলল। কিন্তু শেয়ালের তখন মাথার ঠিক নেই; সে পাগলের মতো কেবল ঝাপাঝাপি-লাফালাফি করতে থাকল আর কেবলি হাঁস তার নাকের সামনে দিয়ে যেতে থাকল—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, দশ, পোনেরো, কুড়ি, বাইশ! শেয়াল তাদের একটি পালক পর্যন্ত ছিঁড়ে নিতে পারলে না। শেয়াল এমন নাকাল কখনো হয়নি। চাঁদপুরের শেয়াল সে, কতবার গুলির মুখ থেকে মুরগি-হাঁস শিকার করেছে তার ঠিক নেই; শেয়ালের রাজা বললেই হয় ; কিন্তু এই শীতকালে হাঁস-শিকার করতে আজ তার ঘাম ছুটে গেল! সারাদিন ধরে মোটা-সোটা চিকচিকে হাঁস দলে-দলে তার নাকের উপর দিয়ে যাওয়া-আসা করছে, অথচ একটাকেও সে ধরে খিদে মেটাতে পারছে না! সব চেয়ে তার লজ্জা—মানুষটাও তাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে! আর তার দুর্দশার কথা সেই পোষা রাজহাঁসটাও জেনে গেল! দেশে-দেশে নিশ্চয়ই তারা চাঁদপুরের খেঁকশেয়ালের কীর্তি-কাহিনী রাষ্ট্র করে দেবেই-দেবে।

ভোরে এই শেয়ালের গা চিকচিকে, ল্যাজ মোটা, রোঁয়াগুলো কেমন যেন সাটিনের মতো খয়েরি-কালো-শাদা ঝকঝক করছিল; কিন্তু বিকেলে তার পেটের চামড়া ঝুলে পড়েছে, গা ধুলোয়-ঘামে কাদা হয়ে গেছে, চোখ ঝিমিয়ে পড়েছে, জিভ চার-আঙুল বেরিয়ে পড়ে মুখে গোটানাল ভাঙছে। তাকে দেখে কে বলবে সকালের সেই দুরন্ত শেয়াল! সারাদিন ধরে কেবলি উড়ে-উড়ে হাঁসের দল তাকে এমনি নাকাল করেছে যে, বেচারা শেয়াল একেবারে হয়রান হয়ে পড়েছে; তার মাথার আর ঠিক নেই; কেবলি দেখছে যেন চোখের সামনে হাঁস ঘুরছে। সে গাছের তলায় সূর্যের আলো দেখে ভাবছে হাঁস; প্রজাপতি উড়লে

হাঁস বলে লাফিয়ে ধরতে যাচ্ছে! যতক্ষণ দিনের আলো রইল চকা-নিকোবরের দল কিছু দয়া-মায়া না করে শেয়ালকে হয়রান করেই চলল। শেয়ালের তখন আর নড়বার শক্তি নেই, সে কেবল মাটির উপরে হাঁসের ছায়াগুলো থাবা দিয়ে-দিয়ে আঁচড়াতে থাকল। হাঁসেরা যখন দেখলে শেয়ালটা মড়ার মতো শুকনো পাতার উপরে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লেগেছে, তখন তারা—"কেমন! কেমন! হাঁস ধরবে!" বলতে-বলতে চাঁদপুরের জঙ্গল ছেড়ে নালমুড়ির চরের দিকে চলে গেল।

হং পাল



ঝাউ-গাছের উপর থেকে খোঁড়া হাস ঠোঁটে-করে রিদয়কে বাগদী-চরের থেকে একটু দূরে নালমুড়ির চরে নামিয়ে দিয়ে সারাদিন বুনো হাঁসের দলের সঙ্গে শেয়ালকে নিয়ে ঝপ্পটি আর দাঁতকপাটি খেলে বেড়াচ্ছে। ক্রমে সন্ধ্যে হয়ে এল দেখে রিদয় ভাবছে, নিশ্চয়ই হাঁসেরা রাগ করে তাকে ফেলে গেছে, এখন কেমন করে সে বাড়ি যায়? আর কেমন করেই বা ঐ বুড়ো-আংলা চেহারা নিয়ে বাপ-মায়ের সঙ্গে দেখা করে? ঠিক এই সময় মাথার উপর ডাক দিয়ে হাঁসের দল উড়ে এসে নালমুড়িতে ঝুপঝাপ পড়েই জলে নেমে গেল। চরে মেলাই কাছিমের ডিম, রিদয় তারি একটা ওবেলা, একটা এবেলা খেয়ে পেট ভরিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ল। এমনি সে-রাত কাটল। ভোর না হতে হাঁসের দল রিদয়কে নিয়ে আবার চলল। রিদয় দেখলে হাঁসেরা তাকে বাড়ি যাবার কথা বললে না। সেও সে-কথা চেপে গিয়ে চুপচাপ খোঁড়া হাঁসের পিঠে চুপটি করে উঠে বসল।

লুসাই হাঁসের ডানাটা শেয়ালের কামড়ে একটু জখম হয়েছে, কাজেই বুনো হাঁসের দল আজ আর বেশি দূরে উড়ে গেল না। গোবর-তলির মাটির কেল্লা 'নুড়িয়া ক্যাসেলের' উপরটায় এসে দেখতে লাগল, সেখানে মানুষ আছে কিনা। সেখানে শিকে-গাঁথা ফাটা-চটা কতকগুলো মাটির সঙ, পরী, সেপাই—এমনি সব। বাগানে মালি নেই, মালিকও নেই, কেবল একটা ভাঙা ফটকের মার্বেল-পাথরে কালি-দিয়ে-দাগা সাইন বোর্ডে লেখা রয়েছে—"পালদিং অফ্ নুড়িয়া।" ঠিক তারি নিচে একটা ভাঙা পিপের মধ্যে বসে একটা রোগা, কানা দেশী কুকুর পোড়ো কেল্লায় পাহারা দিচ্ছে।

বুনো হাঁসেরা আকাশ থেকে শুধোলে—"ছপ্পড়টা কার? ছপ্পড়টা কার?"

কুকুরটা অমনি আকাশে নাক তুলে চেচিয়ে উঠল, ভেউ-ভেউ করে বললে—"ছপ্পড় কি? দেখছ না এটা নুড়িয়ার কেল্লা—পাথরে গাঁথা! দেখছ না কেল্লার বুরুজ, তার উপরে ওই গোল-ঘর—সেখানে

কামান-বসাবার ঘুলঘুলি, নিশেন ওড়াবার দাণ্ডা। গবাক্ষ, বাতায়ন, দরশন-দরওজা। এ-সব দেখছ না!"

হাঁসের কিছুই দেখতে পেলে না—না কামান, না ঘুলঘুলি, না গবাক্ষ, না বাতায়ন। কেবল একটা চিলের ছাদে একটা আকাশ-পিদিম দেবার বাঁশ দেখা গেল, তাতেও এক-টুকরো গামছা-ছেঁড়া লটপট করছে! হাঁসেরা হো-হো করে হেসে বললে—"কই? কই?"

কুকুরটা আরো রেগে বললে—"দেখছ না, কেল্লার ময়দান যেন গড়ের মাঠ! দেখছ না, কেলিকুঞ্জ—সেখানে রানী থাকেন। দেখ ওই হাম্মাম, সেখানে গোলাপজলের ফোয়ারা। দেখতে পাচ্ছ না বাগ-বাগিচা, আম-খাস, দেওয়ান-খাস?" হাঁসেরা দেখলে, পানা-পুকুর, লাউ-কুমড়োর মাচা—এমনি সব, আর কিছু নেই।

কুকুর আবার চেঁচিয়ে বললে—"ঐ দেখ ওদিকে গাছ-ঘর, মালির ঘর; আর এই সব সুরকি-পাতা রাস্তার ধারে-ধারে পাথরের পরী, গ্যাস-লাইটের থাম, বাঁধা ঘাট, বারো-দোয়ারি নাটমন্দির। এসব কি চোখে পড়ছে না! যে বলছ ছপ্পড় কার? ছপ্পড়ে কখনো কেলিকানন, পুষ্পকানন, কামিনীকুঞ্জ থাকে? না, পাথরের পরী, ঘাটের সিঁড়ি থাকে? ঐ দেখ রাজার কাচারি, ঐ হাতিশাল, ঘোড়াশাল, তোষাখানা। এসব কি ছপ্পড়ে থাকে? না ছপ্পড় কখনো দেখেছ? ছপ্পড় দেখতে হয়তো ওপাড়ার ওই জমিদার-গুলোর বাড়ি দেখে এস। আমার মনিব কি জমিদার? এরা মুর্ধাভিষিক্ত। লেখাপড়ার ধার দিয়েও যায় না। ঘোড়া-রোগে এদের সবাই মরেছে। সেকালে এরা চীনের রাজা ছিল। এখনো দেখছ না ফটকে লেখা—'পাল্‌দিং অফ মুড়িয়া!' এই ছপ্পড়ের নহবতখানার চুড়ো দশক্রোশ থেকে দেখা যায়—এমনি ছপ্পড় এটা!"

কানা কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ করে থামলে হাঁসেরা হাসতে-হাসতে বললে—"আরে মুখ্যু, আমরা কি তোর রাজার কথা, না রাজ-বাড়ির কথা, না মাটির কেল্লার কথা শুধোচ্ছি? ওই ভাঙা ফটকের ধারে পোড়ো বাগানে ভাঙা মদের পিপেটা কার, তাই বল না!" এমনি রঙ-তামাশা করতে-করতে হাঁসেরা নুড়িয়া ছাড়িয়ে সুরেশ্বরে—যেখানে প্রকাণ্ড ঠাকুর-বাড়ির ধারে সত্যিকার বাগ-বাগিচা, দীঘি-পুষ্করিণী, ঘাট-মাঠ রয়েছে, সেইখানে কুশ-ঘাসের গোড়া খেতে নামল। ওদিকে মেঘনা, এদিকে পদ্মা—এই দুই নদী যেখানে মিলেছে, সেই কোণটিতে হলো সুরেশ্বর-মঠ। চারদিকে আম-বাগান, জাম-বাগান, ঠাকুর-বাড়ি, অতিথশালা, ভোগ-মন্দির, দোলমঞ্চ, আনন্দবাজার, রথতলা, নাট-মন্দির, রন্ধনশালা, ফুল-বাগান, গোহাল-গোষ্ঠ, পঞ্চবটী, তুলসীমঞ্চ, রাসমঞ্চ, রামকুণ্ডু, সীতাকুণ্ড, গোলকধাম, দেবদেবী-স্থান—এমনি একটা পরগনা জুড়ে প্রকাণ্ড ব্যাপার! এরি এক-কোণে বন আর মাঠ। সেইখানে হাঁসেদের সঙ্গে রিদয় নেমেছে। কেন যে এত বেলা থাকতে এখানে হাঁসেরা এসে আড্ডা গেড়ে বসল, রিদয় তা বুঝলে না, ভেবেও দেখলে না, নিজের মনে বনে-বনে ঘুরে পাত-বাদাম আর শাক-পাতা কুড়িয়ে ছায়ায়-ছায়ায় খেলে বেড়াতে লাগল।

লুসাই হাঁসের ডানা ভালো হওয়া পর্যন্ত হাঁসেরা সেখানে অপেক্ষা করবার মতলব করেছে। একদিন খোঁড়া হাঁস দুটো শোল-মাছের ছানা এনে রিদয়কে দিয়ে বললে—"খেয়ে ফেল। মাছ না খেলে রোগা হবে।" রিদয় এবারে টপ-করে হাঁসের মতো সে-দুটো গিলে ফেললে। তারপর খোঁড়া হাঁসের পিঠে চড়ে নানা-রকম খেলা চলল। কোনো দিন জলে বুনো হাঁসদের সঙ্গে সাঁতার-খেলা, কোনো দিন দৌড়াদৌড়ি, লুকোচুরি, হাঁসের লড়াই—এমনি সারাদিন ছুটোছুটি চেঁচামেচি! এমন আনন্দে রিদয় জন্মে কাটায়নি। পড়াশুনো সব বন্ধ, একেবারে কৈলাস পর্যন্ত লম্বা ছুটি আর ছুট! খেলা শেষ হলে দুতিন-ঘণ্টা দুপুর-বেলায় ধলেশ্বরীর ভাঙনের উপরে বসে জিরোনো; বিকালে আবার খেলা; আবার চান; সন্ধ্যাবেলা খেয়ে নিয়েই ঘুম। রিদয়ের খাবার ভাবনা গেছে, শোবারও কষ্ট মোটেই নেই। খোঁড়া হাঁসের ডানায় এখন বেশ ভালো পালকের গদী পেতে সে বিছানা করে নিয়েছে, ঘুম পেলেই সেখানে ঢোকে। কেবল রাত হলেই তার ভয় আসে, বুঝি কাল সকালে বাড়ি ফিরতে হয়! কিন্তু হাঁসেরা তার ফেরবার কথাই আর তোলে না। একদিন, দুদিন, তিনদিন হাঁসেরা সুরেশ্বরেই রইল; কোনো দিকে যাবার নামটি করলে না। রিদয়ও মনে ভরসা পেয়ে সুরেশ্বরের মন্দির, মঠ লুকিয়ে দেখে নিতে লাগল—চারদিক ঘুরে। চারদিনের দিন চকা-নিকোবরকে কাছে আসতে দেখেই রিদয় ভাবলে—এইবার যেতে হল ফিরে! চকা গম্ভীর হয়ে তাকে শুধোলে—"এখানে খাওয়া-দাওয়া চলছে কেমন?"

রিদয় একটু হেসে বললে—"চলছে মন্দ নয়। তবে শীতকাল, ফল বড় একটা নেই।"

চকা তাকে সঙ্গে নিয়ে এক-ঝাড় কাঁচা বেত দেখিয়ে বললে—"বেত খেয়ে দেখ দেখি, কেমন মিষ্টি!"

রিদয় বেত অনেকবার খেয়েছিল, আরো খাবার তার মোটেই ইচ্ছে নেই; কিন্তু চকার হুকুমে খেতে হল। খেয়ে দেখে মিষ্টি গুড়! ঠিক যেন আক চিবোচ্ছে!

চকা বললে—"কেমন, ভালো লাগল কি? গুরুমশায় খাওয়ান শুকনো বেত, তাই লাগে বিশ্রী। যাহোক, এখন বলি শোনো। এই বাগানে, বনে যে তুমি আজকাল একলাটি ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করেছ, এটা ভালো হচ্ছে না।"

রিদয় ভাবলে, এইবার যেতে হল রে!

চকা বলে চলল—"এই বনে তোমার কত শত্রু রয়েছে, তা জানো? প্রথম হচ্ছে শেয়াল, সে তোমার গন্ধে-গন্ধে ফিরছে, সুবিধে পেলেই ধরবে। তারপর ভোঁদড়, ভাম দুজনে আছে—যেখানে-সেখানে গাছের কোটরে ঢুকতে গেলে বিপদে পড়বে কোনদিন! জলের ধারে উদ্‌বেরাল আছে—একলা চান করবার সময় সাবধান! যেখানে-সেখানে জড়ো-করা পাথরের উপরে বসতে যেও না, তার মধ্যে বেঁজি লুকিয়ে থাকতে পারে। শুকনো-পাতা-বেছানো জায়গা দেখলেই সেখানে শুতে যেয়ো না; পাতাগুলো নেড়ে, তলায় সাপ কি বিছে আছে কিনা, দেখা ভালো। মাঠ দিয়ে যখন চল, তখন আকাশের দিকে কি একবার চেয়ে দেখ—সেখানে বাজ-পাখি, চিল, কাক, শকুনি আছে কিনা? সেটা একবার-একবার দেখে চলা মন্দ নয়। ফস-করে ঝোপে-ঝাড়ে উঠতে যেয়ো না; গেরো-বাজগুলো অনেক সময় সেখানে শিকার ধরতে লুকিয়ে থাকে। সন্ধ্যা হলে কান পেতে শুনবে, কোনো দিকে পেঁচা ডাকল কিনা। পেঁচারা এমন নিঃশব্দে উড়ে আসে যে টের পাবে না কখন ঘাড়ে পড়ল!"

তার এত শত্রু আছে শুনে রিদয় ভাবলে, বাঁচা তো তাহলে শক্ত দেখছি। সে চকাকে বললে—"মরতে ভয় নেই। তবে শেয়াল-কুকুরের কিম্বা শকুনের খাবার হতে আমি রাজী নই। এদের হাত থেকে বাচবার উপায় কিছু আছে বলতে পার?"

চকা একটু ভেবে বললে—"বনের যত ছোট পাখি আর জন্তু এদের সঙ্গে ভাব করে ফেলবার চেষ্টা কর; তাহলে কাঠঠোকরা, ইঁদুর, কাঠবেরালি, খরগোস, তালচড়াই, বুলবুলি, টুনটুনি, শ্যামা, দোয়েল, এরা তোমায় সময়-মতো সাবধান করে দেবে; লুকোবার জায়গাও দেখিয়ে দেবে। আর দরকার হয় তো এই সব ছোট জানোয়ারেরা তোমার জন্যে প্রাণও দিতে পারে।"

চকার কথা-মতো সেই দিনই রিদয় এক কাঠবেরালির সামনে উপস্থিত—ভাব করতে। যেমন দৌড়ে রিদয় সেদিকে যাওয়া, অমনি কাঠবেরালির গিয়ে গাছে ওঠা; আর ল্যাজ-ফুলিয়ে কিচ-কিচ করে গালাগালি শুরু করা—"অত ভাবে আর কাজ নেই! তোমাকে চিনিনে? তুমি তো সেই আমতলির রিদয়! কত পাখির বাসা ভেঙেচ, কত পাখির ছানা টিপে মেরেছ। ফাঁদ পেতে, ধামা চাপা দিয়ে কত কাঠবেরালি ধরে খাঁচায় পুরেছ, মনে নেই? এখন আমরা তোমায় বিপদ থেকে বাঁচাব? এই ঢের যে বন থেকে আমরা এখনো তোমায় তাড়িয়ে মানুষের মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছিনে! যাও, আমাদের দ্বারা কিছু হবে না। সরে পড় বাসার কাছ থেকে।"

অন্য সময় হলে রিদয় কাঠবেরালিকে মজা দেখিয়ে দিত! কিন্তু এখন সে ভালোমানুষ হয়ে গেছে; আস্তে-আস্তে হাঁসকে এসে সব খবর জানালে। খোঁড়া হাঁস বললে—"অত দৌড়ে কাঠবেরালের কাছে যাওয়াটা ভালো হয়নি। হঠাৎ কিছু-একটা এসে পড়লে সব জানোয়ারই ভয় পায়, রাগ করে। যখন জানোয়ারদের কাছে যাবে—সহজে, আস্তে, ভদ্রভাবে যাবে। হুটোপাটি করে কিম্বা চুপিচুপি চোরের মতো গেলেই তাড়া খাবে। তোমার স্বভাব একটু ভালো হয়ে এসেছে; এমনি আর দিনকতক ভালোমানুষটি থাকলেই, ওরা আপনিই তোমার সঙ্গে ভাব করবে। তুমি যদি তাদের উপকার কর, তবে তারাও তোমার সহায় হবে—বনের এই নিয়ম জেনে রাখ।"

রিদয় সারাদিন ভাবছে, কেমন করে সে বনের পশু-পাখিদের কাজে লাগতে পারবে, এমন সময় খবর হল, বেতগায়ের একটা চাষা কাঠবেরালের বৌকে ধরে খাচায় বন্ধ করেছে; আর সে-বেচারার

আটদিনের বাচ্চাগুলি না খেয়ে মরবার দাখিল! খোড়া হাস রিদয়কে বললে—"দেখ, যদি কাঠবেরালির উপকার করতে চাও তো এই ঠিক সময়।" রিদয় অমনি কোমর-বেঁধে সন্ধানে বেরুল।

লক্ষ্মীবার পিঠে-পার্বণের দিন কাঠবেরালের বৌ-চুরি হল সুরেশ্বরে, আর শনিবার বাগবাজারে ছাপার কাগজে বার হল সেই খবর। কাগজওয়ালা-ছোঁড়াগুলো গলিতে-গলিতে হেঁকে চলল—

সুরেশ্বরে মজা ভারি—কাঠবেরালের বৌ চুরি!

বুড়ো-আংলা মানুষ এল, দুটো বাচ্ছা দিয়ে গেল।

মহন্ত ঠাকুর বড় দয়াল!

খাঁচা খুলে, ছেড়ে দিলে বাচ্ছা-সমেত কাঠ-বেরাল।

মজার খবর এক পয়সা—পড়ে দেখ এক পয়সা!

কাণ্ডটা হয়েছিল এই : কাঠবেরালের বৌটি ছিল একেবারে শাদা ধপধপধপে; তার একটা রোঁয়াও কালো ছিল না! চোখ-দুটি মানিকের মতো লাল টুকটুকে, পাগুলি গোলাপী, এমন কাঠবেরালি আলিপুরেও নেই! এ এক নতুনতর ছিষ্টি! গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো, রেল-কোম্পানীর সায়েব-সুবো তাকে ধরতে কত ফাঁদই পেতেছে, কিন্তু এ-পর্যন্ত কাঠবেরালি ধরা দেয়নি। পোষ-পার্বণের দিন বাদামতলী দিয়ে আসতে-আসতে এক চাষা এই কাঠবেরালিকে টোকা চাপা দিয়ে হঠাৎ কেমন করে পাকড়াও করে ঘরে এনে একটা বিলিতি-ইঁদুরের খাচায় বন্ধ করলে। পাড়ার লোক—ছেলে-বুড়ো, এই আশ্চর্য কাঠবেরালি দেখতে দলে-দলে ছুটে এল। এক ডোম তার জন্যে এক চমৎকার খাঁচা-কল তৈরি করে এনে দিলে। খাচার মধ্যে শোবার খাট, দোলবার দোলনা, দুধের বাটি, খাবার খৈ রাখবার ঝাঁপি, বসবার চৌকি—এমনি সব ঘর-কন্নার ছোট-ছোট সামিগ্রী দিয়ে সাজানো। সবাই ভাবলে, এমন খাঁচায় কাঠবেরালি সুখে থাকবে—খেলে বেড়াবে সারাদিন, দোলনায় দুলবে আর খৈ-দুধ খেয়ে মোটা হবে! কিন্তু কাঠবেরালি-বৌ চুপটি করে মুখ লুকিয়ে খাঁচার কোণে বসে রইল আর থেকে-থেকে কিচ-কিচ করে কাঁদতে থাকল। সারাদিন সে কিছু মুখে দিলে না, দোলনাতেও দুললে না, চৌকিতেও বসল না, খাটেও শুল না; কেবলি ছটফট করতে লাগল আর কাঁদতে থাকল।

সুরেশ্বরের পুজো দেবার জন্যে চাষার বৌ সেদিন মালপো ভাজছিল আর সব পাড়ার মেয়েরা পিঠে-পার্বণের পিঠে গড়ছিল। রান্নাঘরে ভারি ধুম লেগে গেছে! উনুন জ্বলেছে; ছেলে-মেয়েরা পিঠে ভাজার ছ্যাঁকছ্যাঁক শব্দ পেয়ে সেদিকে দৌড়েছে। চাষার বৌ ঠাকুরের ভোগ মালপোগুলো কেবলি পুড়ে যাচ্ছে কেন, সেই ভাবনাতেই রয়েছে। ওদিকে উঠোনের বাইরে বেড়ার গায়ে কাঠবেরালির খাঁচাটার দিকে কি হচ্ছে, কেউ দেখছে না। চাষার দিদিমা বুড়ি, সে আর নড়তে পারে না, দাওয়ায় মাদুর পেতে বসে সেই কেবল দেখছে—রান্নাঘরের আলো গিয়ে ঠিক কাঠবেরালির খাঁচার কাছটিতে পড়েছে, আর সারা-সন্ধ্যে কাঠবেরালিটা খাঁচার মধ্যে খুটখাট ছটফট করে বেড়াচ্ছে। এই খাঁচার পাশেই গোয়াল, তার কাছেই সদর দরজা—খোলা। বুড়ি পষ্ট দেখলে বুড়ো-আঙুলের মতো একটি মানুষ উঠোনে ঢুকল। যক্ দেখলে ধনদৌলত বাড়ে, বুড়ি সেটা জানে, কাজেই বুড়ো-আংলাকে দেখে সে একটুও ভয় পেলে না। বুড়ো-আংলা বাড়িতে ঢুকেই কাঠবেরালির খাঁচাটার দিকে ছুটে গেল; কিন্তু খাঁচাটা উঁচুতে ঝুলছে; কাছে একটা পাঁকাটি ছিল, বুড়ো-আংলা সেইটে টেনে খাঁচায় লাগিয়ে সিঁড়ির মতো সোজা কাটি-বেয়ে খাঁচায় চড়ে খাঁচার দরজা ধরে খোলবার চেষ্টা করতে লাগল। বুড়ি জানে খাঁচায় তালা বন্ধ, সে কাউকে না ডেকে চুপ করে দেখতে লাগল—কি হয়! কাঠবেরালি বুড়ো-আংলার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কি যেন বললে ; তারপর বুড়ো-আংলা কাটি-বেয়ে নিচে নেমে চোঁচা দৌড় দিলে বনের দিকে। বুড়ি ভাবছে যক্ আর আসে কিনা, এমন সময় দেখলে বুড়ো-আংলা ছুটতে-ছুটতে আবার খাঁচার কাছে দৌড়ে গেল—হাতে তার দুটো কি রয়েছে। বুড়ি তা দেখতে পেলে না, কিন্তু এটুকু সে পষ্ট দেখলে যে বুড়ো-আংলা একটা পোঁটলা মাটিতে রেখে, আর-একটা নিয়ে খাঁচার কাছে উঠল; তারপর এক হাতে খাঁচার কাটি ফাঁক করে জিনিসটা খাচার মধ্যে গলিয়ে দিয়ে, মাটি থেকে অন্য জিনিসটা নিয়ে আবার তেমনি করে খাঁচায় দিয়ে

দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

বুড়ি আর চুপ করে বসে থাকতে পারলে না, সে ভাবলে, যক্ বোধ হয় তার জন্যে সাত-রাজার ধন মানিক-জোড় রেখে পালাল। খাঁচাটা খুঁজে দেখতে বুড়ি উঠল। বুড়ির কালো-বেড়ালও এতক্ষণ খাঁচার দিকে নজর দিচ্ছিল, সেও উঠে অন্ধকারে গা-ঢাকা হয়ে দাঁড়াল কি হয় দেখতে। বুড়ি পৌষমাসের হিমে উঠোন দিয়ে চলেছে, এমন সময় আবার পায়ের শব্দ, আবার বুড়ো-আংলা হাতে দুটো কি নিয়ে! এবারে বুড়ো-আংলার হাতের জিনিস কিচ—কিচ করে ডেকে উঠল। বুড়ি বুঝলে যক্ কাঠবেরালির ছানাগুলিকে দিতে এসেছে—তাদের মায়ের কাছে। দিদিমা উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখলেন, যক্ আগের মতো খাঁচার কাছে গেল, কিন্তু বেড়ালের চোখ অন্ধকারে জ্বলছে দেখে, সে যেখানকার সেইখানেই দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখতে লাগল—ছানা দুটি বুকে নিয়ে। উঠোনে বুড়িকে দেখে ছুটে এসে তার হাতে একটি ছানা দিয়ে বুড়ো-আংলা আগের মতো কাটি-বেয়ে একটির পর একটি ছানাকে খাঁচায় পুরে দিয়ে বুড়িকে পেন্নাম করে চলে গেল।

বুড়ি ঘরে এসে সবার কাছে এই গল্প করলে, কিন্তু কেউ সেটা বিশ্বাস করতে চাইলে না—দিদিমা স্বপন দেখেছে বলে উড়িয়ে দিলে। কিন্তু বুড়ি বলতে লাগল—"ওরে তোরা দেখে আয় না!"

সকালে সত্যি দেখা গেল চারটে ছানাকে নিয়ে কাঠবেরালি দুধ খাওয়াচ্ছে। এমন ঘটনা কেউ দেখেনি! সুরেশ্বরের মোহন্ত পর্যন্ত এই আশ্চর্য ঘটনা দেখতে হাতি চড়ে চাষার বাড়ি উপস্থিত! ওদিকে চাষার বৌ যত পিঠে সিদ্ধ করে, সবই পুড়ে ছাই হয়ে যায়, সুরেশ্বরের মালপো ভোগও হয় না, তখন মোহন্ত পরামর্শ দিলেন—"ওই কাঠবেরালি নিশ্চয় সুরেশ্বরী, নয় আর-কোনো দেবী, ওকে ছোনা-পোনা সুদ্ধ বন্ধ করেছ, হয়তো সুরেশ্বর তাই রাগ করেছেন। না হলে মালপো-ভোগ পিঠে-ভোগ হঠাৎ পুড়েই বা যায় কেন? যাও, এখনি ওঁদের যেখানে বাসা, সেইখানে দিয়ে এস। না হলে আরো বিপদ ঘটতে পারে!"

চাষা তো ভয়ে অস্থির! গ্রামসুদ্ধ কেউ আর খাঁচায় হাত দিতে সাহস পায় না। তখন সবাই মিলে দিদিমাকে সেই খাঁচা নিয়ে বনে কাঠবেরালির বাসায় পাঠিয়ে দিলে। বুড়ি যেখানকার জিনিস সেখানে রেখে, আসবার সময় রাস্তার মাঝে একটা মোহর পেয়ে গেল। 'যতো ধর্ম স্ততো জয়' বলে খবরের কাগজের সম্পাদক খবরটা শেষ করলেন। এই বুড়ো-আংলাটি কিনি—লোকে তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল সুরেশ্বরে, বাগবাজারে, ফরিদপুরে, যশোরে, ময়মনসিংহে, আগরতলায়, আসামে, কাছাড়ে!

এই ঘটনার দুদিন পরে আর-এক কাণ্ড! গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র যেখানে এক হয়েছে, সেইখানে আড়ালিয়ার চর। বুনোহাঁসের সঙ্গে রিদয়কে নিয়ে খোঁড়া হাঁস সেই চরে চরতে নামল। চরটা কেবল বালি, মাঝে-মাঝে ছোটছোট ঝাউ, আর এখানে-ওখানে শুকনো ঘাস। চরের একদিকে আড়ালিয়া গ্রাম। হাঁসরা চরছে, এমন সময় চরের উপরে কতকগুলো জেলের ছেলে খেলতে এল। মানুষ দেখেই চকা হাঁক দিলে, আর অমনি সব বুনো হাস ডানা-মেলে উড়ে পড়ল। কিন্তু খোঁড়া হাঁস ছেলে দেখে একটুও ভয় পেলে না ; বরং গলা চড়িয়ে বুনো হাঁসদের বললে—"ছেলে দেখে ভয় কি?"

রিদয় হাঁসের পিঠ থেকে নেমে একটা ঝাউতলায় বসে ঝাউফুল কুড়িয়ে মার্বেল খেলছে, ছেলেগুলো কাছে আসতেই সে একবার শিস দিয়ে খোঁড়াকে সাবধান করে একটা ঘাস-বনে লুকিয়ে পড়ল। কিন্তু খোঁড়ার আজ কি যে হল, সে যেমন চরছিল তেমনি চরে বেড়াতে লাগল। ছেলেদুটো একটা বালির টিপি ঘুরে একেবারে দুদিক থেকে হাঁসকে তাড়া করলে। কেমন করে যে তারা এত কাছে হঠাৎ এলে পড়ল, ভেবে না পেয়ে খোঁড়া একেবারে হতভম্ব! উড়তে যে জানে তা মনেই এল না। সে ক্রমাগত দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। তারপর একটা ডোবার কাছে গিয়ে খোঁড়া ধরা পড়ে গেল।

রিদয়ের প্রথমে মনে এল যে ছুটে গিয়ে ছেলে-দুটোকে থাবড়া মেরে হাঁসটা কেড়ে নেয়, কিন্তু তখনি মনে পড়ল, সে ছোট হয়ে গেছে! তখন সে রেগে বসে-বসে কেবলি বালি খুঁড়তে লাগল। এদিকে খোঁড়া ডাকছে—"বুড়ো-আংলা ভাই, এস লক্ষ্মীটি, আমায় বাঁচাও!"

"ধরা পড়ে এখন বাঁচাও!" —বলে রিদয় ছেলে-দুটোর সঙ্গে দৌড়ল। ছেলে-দুটো হাঁস নিয়ে একটা নালা পেরিয়ে চর ছেড়ে গ্রামে ঢুকল।

রিদয় আর তাদের দেখতে পেলে না। নালায় অনেক জল। রিদয় অনেকটা ঘুরে তবে একটা শুকনো-গাছের ডাল বেয়ে ওপারে উঠে, হাঁসকে খুঁজতে মাটির উপর ছেলেদের পায়ের চিহ্ন ধরে এগিয়ে চলল। একটা চৌমাথায় দেখা গেল, ছেলে-দুটো দুদিকে গেছে। কোন পথে যাওয়া যায়, রিদয় ভাবছে, এমন সময় বাঁকের রাস্তায় একটা হাঁসের পালক রয়েছে দেখে রিদয় বুঝলে, হাঁস এই পথে গেছে—পালক ফেলতে-ফেলতে, যাতে সে সন্ধান পায় সেই জন্যে।

রিদয় পালকের চিহ্ন ধরে দুটো মাঠ পেরিয়ে গ্রামের একটা সরু গলি পেলে। গলির মোড়ে একটা মন্দির। হাঁস কোথায় দেখা নেই, মন্দিরের খিলেনের উপরে লেখা—"হংসেশ্বরী!" আর তারি উপরে মাটির গড়া এক হাঁস। রিদয় রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে সেই দিকে চেয়ে আছে, এদিকে পিছনে প্রায় একশো লোক জমা হয়েছে—নাকে তিলক, কপালে ফোঁটা, নেড়া-মাথা বৈরিগীর দল! রিদয় যেমনি ফিরেছে অমনি সবাই মাটিতে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে বললে—"জয় প্রভু বামনদেব, ঠাকুর, কৃপা কর!"

বামন কে, রিদয় তা জানত না, কিন্তু প্রণামের ঘটা দেখে সে বুঝলে, সবাই তাকে দেবতা ভেবেছে। রিদয় অমনি গম্ভীর হয়ে বললে—"তোমরা আমার হাঁস চুরি করেছ, এখনি এনে দাও। না হলে হংসেশ্বরীর কোপে পড়ে যাবে।"

সবাই মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। তখন হংসেশ্বরীর পাণ্ডা গলবস্তর হয়ে বললে—"ঠাকুর, হাঁস কোথায় আছে বলে দিন, এখনি এনে দিচ্ছি!"

রিদয় রেগে বলে উঠল—"কোথায় জানলে কি তোমাদের আনতে বলি? এই গ্রামের দুটো ছেলে তাকে নিয়ে এসেছে—এই দিকে।"

এই কথা হচ্ছে এমন সময় মন্দিরের পিছন দিকে হাঁসের ডাক শোনা গেল। বেচারা প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে! রিদয় দৌড়ে সেদিকে গিয়ে দেখে একটা ঘরের উঠোনে এক বুড়ি খোঁড়া হাঁসকে দুই হাঁটুতে চেপে ধরে ডানা কেটে দেবার উদ্যোগ করছে—দুটো পালক কেটেছে, আর দুটো মুঠিয়ে ধরে কাটবার চেষ্টায় আছে। হঠাৎ বুড়ো-আংলা-রিদয়কে দেখে বুড়ি একেবারে হাঁ হয়ে গেল! সেই সময়ে যত নেড়ানেড়ির দল ছুটে এসে হৈ-হৈ করে বুড়ির হাত থেকে খোঁড়া হাঁস ছাড়িয়ে নিলে। রিদয় হাঁসের উপরে চড়ে বসল আর অমনি রাজহাঁস তাকে নিয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল।

বৈরিগীর দল সেই হাঁসের পালক হংসেশ্বরীর পরমহংস-বাবাজীর কাছে হাজির করে দিলে। তিনি পালক-কটি একটা হাঁড়িতে রেখে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন—"অভূতপূর্ব ঘটনা! হংসেশ্বরীর রাজহংস স্বশরীরে বামনদেবকে নিয়ে উপস্থিত হয়ে দুটি পালক রক্ষা করে গেছেন। সে জন্য একটি সোনার কৌটার প্রয়োজন। হিন্দুমাত্রেরই এই বিষয়ে মুক্তহস্ত হওয়া উচিত। চাঁদা আমার কাছে মঃ অঃ করিয়া পাঠাইবেন। ইতি—সুরেশ্বরের পরমহংস বাবাজী।"

মানুষদের মধ্যে যেমন খবরের কাগজ, পাখিদের মধ্যে তেমনি খবর রটাবার জন্য পাখি আছে। কোথাও কিছু নতুন কাণ্ড হলেই সেই জায়গাটার উপরে প্রথমে কাক-চিল জড়ো হয়, তারপর তাদের মুখে এ-পাখি, এপাখির মুখে ও-পাখি—এমনি এ-বন, সে-বন, এ-দেশ, সে-দেশে দেখতে দেখতে খবর রটে যায়।

কাঠবেরালির কথা আর খোঁড়া হাঁস উদ্ধারের কথা রিদয় ফিরে আসার পূর্বে হাঁসের দলে, বনে-জঙ্গলে, জলে-স্থলে কোনো জানোয়ারের জানতে আর বাকি রইল না। গাছে-গাছে তাল-চড়াই, গাং-শালিক—এরা সুরেতালে রিদমের কীর্তি-কথা ঢেঁড়া-পিটিয়ে বলে বেড়াতে লাগল:

শুন এবে অবধান পশুপক্ষিগণ।

বুড়ো-আংলা মহাকাব্য করি বিবরণ॥

কাঠবেরালি রামদাস তাহারে উদ্ধরি।

বীরদাপে চলে যথা রাজহংসেশ্বরী॥

হাঁসের পালক দুটা কেটে নিল বুড়ি।
যাহে লেখা যায় মহাকাব্য ঝুড়ি-ঝুড়ি॥
হাঁসের দুর্দশা দেখি আংলা বুড়ো ধায়।
হংসেশ্বরী ছাড়ি বুড়ি পালাল ঢাকায়॥
মোহন্ত তুলিয়া নিল হংসের কলম।
সোনা চাই বলি তাহে লেখে বিজ্ঞাপন॥
তালচটক তাল ধরে গানশালিকে কয়।
সুবচনী হাঁস নিয়ে চলিল রিদয়॥
খোঁড়া হাঁসেরে লইয়া, খোঁড়া হাঁসেরে লইয়া
রচিলাম মহাকাব্য যতন করিয়া।
আংলা বিজয় নামে কাব্য চমৎকার।
গোটা দুই শ্লোক তারি দিনু উপহার॥
সকলে শুনহ আর শুনাহ অন্যকে।
ক্ষীর হতে নীর পিয়ে ধন্য হোক লোকে॥
ইতি আংলা বিজয় মহাকাব্যে প্রথম সর্গঃ।

আজ চকা-নিকোবর ভারি খুশি। সে রিদয়কে কুর্নিস করে বললে—"একবার নয়, বার-বার তিনবার তুমি দেখিয়েছ যে পশু-পাখিদের তুমি পরমবন্ধু! প্রথমে শেয়ালের মুখ থেকে বুনো হাঁস 'লুসাইকে' উদ্ধার, তার পরে কাঠবেরালির উপকার, সব-শেষে পোষা হাঁসকে বাঁচানো। তোমার ভালোবাসায় আমরা কেনা হয়ে রইলেম। আর তোমায় আমরা ফেরাতে চাইনে। তোমার যদি মানুষ হতে ইচ্ছে হয় তো বল আমি নিজে গণেশঠাকুরকে তোমার জন্যে 'রেকমেণ্ডেসন' পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

রিদয়ের আর মোটেই মানুষ হতে ইচ্ছে ছিল না। হাঁসেদের সঙ্গে দেশ-বিদেশ দেখতে-দেখতে বড় মজাতেই সে দিন কাটাচ্ছে, তবু মানুষ-হবার রেকমেণ্ডেসনখানা না নিলে চকা পাছে কিছু মনে করে, সেই ভয়ে বললে—"মানুষ হবার সময় হলে আমি তোমাকে জানাব। এখন কিছুদিন তোমাদের সঙ্গে থাকতে আমি ইচ্ছে করেছি।"

চকা ঘাড় নেড়ে বললে—"সেই ভালো; যখন ইচ্ছে হবে বল, আমি সার্টিফিকিট দিয়ে তোমাকে গণেশের কাছে পাঠাব। এখন হাঁসের দলে হংসপাল হয়ে থাক।" বলে চকা রিদয়ের মাথাটা ঠোঁট দিয়ে চুলকে দিলে। অমনি চারদিকে বুনো হাঁস রিদয়ের নতুন উপাধি ফুকরে উঠল—"হংপাল! হংপাল!"

বনের পাখিরা প্রতিধ্বনি করলে—"হি-রি-দ-য় হংসপাল!"

টুং-সোন্নাটা-ঘুম



সুরেশ্বর ছেড়ে বৃষ্টি আরম্ভ হল। এতদিন রোদে কাঠ ফাটছিল। সকালে যখন হাঁসের দল যাত্রা করে বার হল তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার কিন্তু ব্রহ্মপুত্র-নদের রাস্তা ধরে যতই তারা উত্তর-মুখে এগিয়ে চলল, ততই মেঘ আর কুয়াশা আর সঙ্গে-সঙ্গে বৃষ্টি দেখা দিলে! হাঁসের ডানায় পাহাড়ের হাওয়া লেগেছে, তারা মেঘ কাটিয়ে হু-হু করে চলেছে; মাটির পাখিদের সঙ্গে রঙ-তামাশা করে বকতে-বকতে চলবার আর সময় নেই, তারা কেবলি টানা স্বরে ডেকে চলেছে—"কোথায়, হেথায়, কোথায়, হেথায়।"

হাঁসের দলের সাড়া পেয়ে ব্রহ্মপুত্রের দুপারের কুঁকড়ো ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে জানান দিতে শুরু করলে। পুব পারের কুঁকড়ো হাঁকলে—"সাতনল, চন্দনপুর, কোমিল্লা, আগরতলার রাজবাড়ি, টিপারা, হীলটিপারা!" পশ্চিম পারের কুঁকড়ো হাঁকলে—"মীরকদম, নারাণগঞ্জ, ঢাকার নবাববাড়ি, মুড়াপাড়া।" পুবে হাঁকলে—"ভেংচার চর", পশ্চিমে হাঁকলে—"চর ভিন-দোর।"

হাঁসেরা তেজে চলেছে, এবার ছোট-ছোট গ্রাম, নদীর আর নাম শোনা যাচ্ছে না, বড়-বড় জায়গার কুঁকড়ো হাঁকছে—"পাবনা, রামপুরবোয়ালিয়া, বোগরা, রাজসাহি, দিনাজপুর, রংপুর, কুচবেহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি!" পুবের কুঁকড়ো অমনি ডেকে বললে—"খাসিয়া-পাহাড়, গারো-পাহাড়, জৈঁতিয়া-পর্বত, কামরূপ।"

বুনো-হাঁসের দল পাহাড়-পর্বত অনেক দেখেছে, শিলিগুড়ি থেকে হিমালয় ডিঙ্গিয়ে মানস-সরোবরে চট করে গিয়ে পড়া গেলেও তারা শিলিগুড়ি থেকে ডাইনে ফিরে, ফুলচারি, হাড়গিলের-চর, ধুবড়ি, শিলং, গৌহাটি, দিব্রুগড়, কামরূপ হয়ে যাবার মতলবই করলে, কেননা, দার্জিলিঙ হয়ে যাওয়া মানে ঝড়-ঝাপটা, বরফের উপর দিয়ে যাওয়া, আর কামরূপের পথে গেলে ব্রহ্মপুত্র-নদের দুধারে নগরে গ্রামে চরে জিরিয়ে যাওয়া চলে।

রিদয় কিন্তু বেঁকে বসল, এত কাছে এসে দার্জিলিঙ যদি দেখা না হল তো হল কি? খোঁড়া হাঁসের যদিও পায়ে বাত তবু রিদয়ের কথাতেই সে সায় দিয়ে বসল! ঠিক সেই সময় শিলিগুড়ি থেকে ছোট রেল বাঁশি দিয়ে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলে, রিদয় আকাশের উপর থেকে দেখলে, যেন শাদা-কালো একটি গুটিপোকা একে-বেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছে—হাঁসে চড়া রিদয়ের অভ্যেস, রেল এত ঢিমে চলছে দেখে ভেবেছিল, গুগলীর মতো কত বছরই লাগবে ওটার দার্জিলিঙ পৌছতে!

রিদয় চকাকে শুধোলে, “ওটা কতদিনে দার্জিলিঙ পৌছবে?”

চকা উত্তর দিলে—“এই সকাল আটটায় ছাড়ল, বেলা তিনটে-চারটেতে পৌঁছে যাবে!”

“আর আমরা কতক্ষণে সেখানে যেতে পারি” —রিদয় শুধোলে।

চকা উত্তর করলে—“যদি রাস্তায় কুয়াশা, হিম না পাই, তবে বড় জোর এক-ঘণ্টায় ‘ঘুম-লেকে’ গিয়ে নামতে পারি, সেখান থেকে কিছু খেয়ে নিয়ে সিঞ্চল, কালিম্পং, লিবং, সন্দকফু থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে কার্সিয়ং, টুং-সোনাদা হয়ে আবার ঘুমেতে নেমে একটু জল খেয়ে একচোট ঘুমিয়ে নিয়ে বেলা সাড়ে-এগারোটা নাগাদ দার্জিলিঙ-ক্যালকাটা রোডের ধারে আলুবাড়ির গুম্পার কাছটায় তোমায় নামিয়ে দিতে পারি। আমরা তিব্বতের হাঁস তার ওদিকে আর আমাদের যাবার যো নেই—গেলেই গোরারা গুলি চালাবে!”

এত সহজে দার্জিলিঙ দেখা যাবে জেনে খোঁড়া হাঁস পর্যন্ত নেচে উঠল। চকা তখন বললে—“এতবড়ো দল নিয়ে তো পাহাড়ে চলা দায়, ছোট রেলের মতো আমাদেরও দল ছোট করে ফেলা যাক। বড়-দলটা নিয়ে আণ্ডামানি কামরূপে হাড়গিলে-চরে গিয়ে অপেক্ষা করুক; আর আমি, খোঁড়া, হংপাল, কাটচাল, নানকৌড়ি, চল দার্জিলিঙ দেখে আসি।” শিলিগুড়ি থেকে হাঁসের দল দুই ভাগ হয়ে চলল, ঠিক সেই সময় গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি নামল। কাঠ-ফাটা রোদের পরে নতুন বৃষ্টি পেয়ে মাটি ভিজে উঠেছে, পাতা গজিয়ে উঠছে, বনের পাখিরা আনন্দে উলু-উলু দিয়ে কেবলি বলতে লেগেছে, বৃষ্টির গান:

বিষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর

বাজছে বাদল গামুর-গুমুর

ডাল-চাল আর মক্কা-মসুর

ফোঁটায়-ফোঁটায় নামে—

আকাশ থেকে নামে—

জলের সাথে নামে—

ঘরে-ঘরে নামে—

টাপুর-টুপুর গামুর-গুমুর

গামুর-গুমুর টাপুর-টুপুর।

‘তিষ্টা’ নদীর কাছে এলে হাসেরা শুনলে, নদীর দুপারে সবাই বলছে:

মেঘ লেগেছে কালা-ধলা

বইছে বাতাস জলা-জলা

বরফ-গলা পাগলা-ঝোড়া

শুকনা ধুয়ে আসে

তিষ্টা নদীর পাশে—

ঝাপুর-ঝুপুর ছাপুর-ছুপুর

ছাপুর-ছুপুর ঝাপুর-ঝুপুর।

নতুন জল-বাতাস পেয়ে পৃথিবী জুড়ে সবাই রোল তুলেছে, আকাশের হাঁসেরাই বা চুপ করে থাকে কেমন করে, তারা পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ির মতো ধাপে-ধাপে আলু, পেঁয়াজ, শাক, সব্জী খেতগুলোর ধার দিয়ে ডাকতে-ডাকতে চলল—"রসা জমি ধ্বসে পড় না, বসে থেক না, ফসল ধরাও, ফল ধরাও, নতুন বীচে ফল ধরাও!"

পাগলা-ঝোড়ার কাছ-বরাবর এসে একখানা প্রকাণ্ড মেঘ হাঁসেদের সঙ্গ নিয়ে উত্তর-মুখে উড়ে চলল। কলকাতার এক বাবু পাহাড়ে রাস্তায় রবারের জুতো রবারের ওয়াটারপ্রফ পরে বিষ্টির ভয়ে নাকে-কানে গলাবন্ধ জড়িয়ে মোটা এক চুরুট টানতে-টানতে ছাতা খুলে হাঁফাতে-হাঁফাতে চড়াই ভেঙে তাড়াতাড়ি বাড়ি-মুখো হয়েছেন দেখে হাঁসেরা রঙ্গ জুড়লে:

জল চাও না, চাও কিন্তু খাসা পাঁউরুটি

হয় না তো সিটি!

জলের ভয়ে তাড়াতাড়ি খুললে কেন ছাতা!

জল না হলে গাছে-গাছে ফলে পেপে আতা?

জল না হলে কোথায় পেতে আলু পটোল চা!

হত নাকো রবার-গাছ কিসে ঢাকতে পা?

বিষ্টি নইলে ছিষ্টি নষ্ট, সেটা মনে রেখ—

মেঘ দেখলে নাক তোলো তো উপোস করে থেক!

সকালে পাবে না চা দুপুরেতে ভাত—

বিকেলে পাবে না ফল, রাতে জলবে আঁত

না পাবে নদীতে মাছ খেতেতে ফসল—

ফোঁটা-ফোঁটা ঝরবে তখন তোমার চোখে জল।

বাবু একবার ছাতার মধ্যে থেকে আকাশে চেয়ে দেখলেন, রিদয় টুপ করে তার নাকের উপর একটা শিল ফেলে হাত তালি দিতে-দিতে হাঁসের পিঠে উড়ে চলল। মেঘখানা শিল বর্ষাতে-বর্ষাতে হাঁসের দলের পিছনে-পিছনে আসছে, আর হাঁসেরা সারি দিয়ে আগে-আগে যেন মেঘখানাকে টেনে নিয়ে চলেছে—আকাশ দিয়ে পুষ্পকরথের মতো! তিন-দরিয়ার অনেক উপরে দুই পাহাড়ের দেয়াল যেন কেল্লার বুরুজের মতো সোজা আকাশ ঠেলে উঠেছে একেবারে মেঘের কাছে, তারি গায়ে পাগলা-ঝোড়া ঝরনা শাদা পৈতের মতো পাহাড়ের গা বেয়ে গাছ-পালার মধ্যে দিয়ে ঝুলে পড়েছে—এই পাহাড়ের দেওয়াল ডিঙিয়ে হাঁসেরা কার্সিয়ংয়ের মুখে চলল—পাংখাবাড়ি থেকে কারসিয়ং দুধারে ঝরনা আর চা বাগান সবজী-খেত, থাকে-থাকে পাহাড়ের গায়ে পাহাড়ি বস্তি, সাহেবদের কুঠি, কার্সিয়ং শহরটা যেন আর একটা ঝরনার মতো দেখা যাচ্ছে—পাহাড়ি গোলাপ গেঁদা গাছা-আগাছার কুঁড়ি ধরেছে।

বাঁ-ধারে দূরে কালে-কালো পাহাড়ের শিখরে বরফের পাহাড় যেন দুধের ফেনার মতে উথলে পড়েছে। একদল বাঙালী বৌ ছেলে-পুলে নিয়ে কার্সিয়ংয়ের ইষ্টিসনের উপরের রাস্তায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছে—গিন্নি সবে অসুখ থেকে উঠেছেন, তিনি ছাতি মাথায় দাণ্ডি চেপে চলেছেন, কর্তা লাঠি ধরে সঙ্গে, পিছনে চার মেয়ে, ছোট-বড় তিন ছেলে, এক বৌ, দুই জামাই, একপাল নাতি-পুতি হাসি-খুশি লুটো-পাটি করে চলেছে! কেউ পাহাড় থেকে ফুল তুলছে, কেউ রাস্তা থেকে নুড়ি কুড়োচ্ছে, একটা ছেলের হাতে প্রজাপতির কুড়োজাল দেখে রিদয় চেঁচিয়ে বললে—"ধর না ধর না, যক্ হবে।"

হাঁসেরা বলে চলল—"ফুল যত চাও তোল, গোলাপ ফুটল বলে, গাঁদা ওই ফুটেছে, চেরি ফুলে রঙ ধরেছে, আমরা এনেছি, নাও কলাই-শুটি নাও, ফুলকপি নাও, আপেল নাও, নাসপাতি যত পার খাও নাও দাও থোও, প্রজাপতি ধরা ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও!"

দেখতে-দেখতে মেঘে কার্সিয়ং ঢেকে গেল, ছেলে-বুড়ো ঘর-বাড়ি বাজার-ইষ্টিশান মায় ছোট রেল গিদা পাহাড় ডাউনহিল সব কুয়াশায় চাপা পড়লো, দূরে সিঞ্চল মেঘের উপরে মাথা তুলে দেখা দিল। এইবার রিদয়ের শীত আরম্ভ হল। খোঁড়া হাস ডানা ছড়িয়ে উড়ে চলেছে, পালকের মধ্যে ঢোকবার যো নেই, জলে-শীতে থরথর করে বেচারা কাপতে লাগল, খোঁড়াও বাঙলাদেশের মানুষ, পাহাড়ের শীতে তারও ডানার পালকগুলো কাটা দিয়ে উঠল, সে ডাক দিলে—"শীত-শীত হংপাল শীতে গেল!"

চকা হাঁকলে—"নেমে পড় কার্সিয়ং!"

হাঁসরা অমনি মেঘের মধ্যে দিয়ে নামতে শুরু করলে। রিদয় দেখলে, মেঘের মধ্যেটায় খোলা আকাশের চেয়ে কম ঠাণ্ডা, যেন পাতলা তুলোর বালাপোষ গায়ে দিয়েছে। হাঁসেরা নামতে-নামতে একটা বাড়ির ছাতে এসে বসল। বাড়ির বাইরে কেউ নেই, কুয়াশার ভয়ে সবাই ঘরে কাঁচ বন্ধ করে বসেছে, বাইরে কেবল গালফুলো একটুখানি একটা পাহাড়ি ছোঁড়া আগুন জ্বেলে কচি ছেলের একজোড়া পশমের মোজা তাতিয়ে নিচ্ছে, আর সেই সঙ্গে নিজের হাত-পাগুলোও একটু সেঁকে নিচ্ছে, এমন সময় ঘর থেকে বাড়ির গিন্নি ডাক দিলেন—"টুকনী!"

ছেলেটা তাড়াতাড়ি হাতের মোজা জোড়া মাটিতে ফেলে দৌড় দিলে, চকা অমনি ছোঁ দিয়ে মোজাটা নিয়ে রিদয়কে দিয়ে বললে—"পরে ফেল উলের জামা।" রিদয় মোজাটা মাথায় গলিয়ে ছেঁড়া মোজার তিনটে ছেঁদা দিয়ে হাত আর মাথা বার করে ফিট হয়ে যেন সোয়েটার পরে দাঁড়াল।

হাঁসের দল তাকে পিঠে নিয়ে আকাশে উঠল—টুকনী ছোঁড়াটা নিচে দাড়িয়ে চেঁচাতে লাগল—"আরে-আরে হাঁস মোজা লেকে ভাগা!"

রিদয় শুনলে গিন্নি চেঁচাচ্ছেন—"হাঁসে কখনো মোজা নেয়? নিশ্চয় মোজাটা পুড়িয়ে রেখে মিছে কথা বলছে! ফের ঝুটবাত বোলতা!"

টুকনীর মোজা-পোড়ানোর মামলার শেষ কি হল দেখবার আর সময় হল না! মেঘ তখন মুষল ধারায় জল ঢালতে আরম্ভ করেছে, হাঁসেরা তাড়াতাড়ি মেঘ ছাড়িয়ে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল আর বন-জঙ্গলকে ডেকে বলতে লাগল—"কত জল আর চাই বল, তেষ্টা যে মেটে না দেখি, মেটে না দেখি!" কিন্তু দেখতে-দেখতে আকাশ নীল মেঘে ছেয়ে গেল, সূর্য কোথায় কোনদিকে তার ঠিক নেই, হাঁসেদের ডানার উপরে বিষ্টি ক্রমাগত চাবুকের মতো পড়ছে, ডানার পালক ভিজে তাদের বুকের পালকে পর্যন্ত জল সেঁধিয়েছে, পাহাড়-পর্বত চড়াই-নাবাই গাছ-পালা ঘন কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেছে—দু'হাত আগে নজর চলে না। পাখিদের গান থেমে গেছে। হাঁসেরা চলেছে, ধীরে-ধীরে পথ খুঁজে-খুঁজে; রিদয় কেবলি শীতে কাঁপছে আর ভাবছে, চুরি করার এই শাস্তি।

এই মেঘ আর কুয়াশার মধ্যে দিয়ে চকা-নিকোবর যখন তাদের কটিকে নিয়ে সিংচল পাহাড়ের সিংএ একটা ঝাউতলায় এসে বলল, তখন যেন রিদয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল! পাহাড়ের চূড়োয় কেবল সোনালী ঘাসের বন আর এক-একটা ছাতের মতো প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পাথর বরফ পড়ে শাদা হয়ে রয়েছে—কোথাও-কোথাও নালা দিয়ে বরফ-জল বয়ে চলেছে, পাতায়-পাতায় টিপটপ করে বিষ্টি লাগছে কিন্তু শীত হলেও হাওয়া এখানে এমন পরিষ্কার যে রিদয় আনন্দে এদিকে-ওদিকে ছুটে বেড়াতে লাগল! বুনো টেঁপারি সোনালী পাতা রুপোলী পাতা সোনা-ঘাস রুপো-ঘাস তুলে-তুলে রিদয় বোঝা বাঁধছে দেখে চকা হেসে বললে—"এগুলো হবে কি?"

রিদয় অমনি বলে উঠল—"দেশে গিয়ে দেখাব!"

খোঁড়া হাস ভয় পেয়ে বললে—"ওই মস্ত বোঝা নিয়ে ওড়া আমার কর্ম নয়, তুমি তবে রেলে করে বাড়ি যাও!"

চকা রিদয়কে ডেকে বললে—"খুব-কাজের জিনিস ছাড়া একটি বাজে জিনিস সঙ্গে নেওয়া আমাদের নিয়ম নয়, পেট ভরে টেঁপারি খাও তাতে আপত্তি নেই, ঘাস দু'কানে দুটো গুঁজতে পার তার বেশি নয়!"

রিদয় দু'কানে দুটো ঘাস গুঁজে টেঁপারি খেয়ে বেড়াচ্ছে এমন সময় ভালুকের সঙ্গে দেখা! রিদয় ভালুক নাচ অনেক দেখেছে কিন্তু এত-বড় এমন রোঁয়াওয়ালা কালো মিস ভালুক সে কোনোদিন দেখেনি, ভালুক তাকে দেখে দু'পা তুলে থপথপ করে এগিয়ে এসে বললে—"এখানে মানুষ হয়ে কি করতে এসেছ? পালাও, না হলে শীতে মরে যাবে, বড় খারাপ জায়গা। গোরাগুলো পর্যন্ত এখানে টিঁকতে পারেনি, কত লোক যে এখানে ঠাণ্ডা আর রাতের বেলায় ভূতের ভয়ে কেঁপে মরেছে তার ঠিক নেই। এখানে এককালে গোরা-বারিক ছিল কাপ্তেন জাঁদরেল সব এখানে থাকত, এখন আর কেউ নেই! কোথায় গেছে তাদের বাগ-বাগিচা বাজার-শহর, কেবল দেখ চারদিকে আগুন-জ্বালাবার চুলোগুলো পড়ে আছে, শীতে সব গোরা ভুত বেরিয়ে এই-সব ভাঙাচুলির ধারে বসে আগুন পোহায় আর মদ খায়, হুক্কা-হুয়া গান গায়।"

ঠিক এই সময় শেয়াল-ডাকের মতো গান শোনা গেল, আর মেম সঙ্গে একটা গোরা বোতোল হাতে টলতে-টলতে আসছে দেখা গেল। ভালুককে দূর থেকে দেখেই গোরা যেমন বন্দুক উঁচিয়েছে, অমনি ভালুক চট করে গাছের তলার অন্ধকারে কালোয়-কালো মিশিয়ে গেছে! রিদয়ের গায়ে টকটকে মোজা—মেম তাকে ভাবলে কার পোষা ছোট বাঁদর, সে অমনি "মাংকি-মাংকি" বলে রিদয়কে ধরতে ছুটল! রিদয় তাড়াতাড়ি যেমন পালাতে যাবে অমনি পাহাড় থেকে গড়াতে-গড়াতে একেবারে কার্ট রোডে মাল-বোঝাই ছোট রেলের ছাতে এসে চিৎপাত!

রেলটা ঝরনা থেকে হোঁস-ফোঁস করে খানিক জল ইঞ্জিনে ভরে নিয়ে ঘুম জোড়বাংলার দিকে এগিয়ে চলল ভকভক করে বকতে-বকতে। এদিকে ভালুকের কাছে খবর পেয়ে হাঁসেরা উড়েছে ঠিক রেলের সঙ্গে-সঙ্গে—তারা দেখছে, রিদয় মালগাড়ির উপরটায় যেন একটি লাল নিশেনের মতো লটপট করছে। ঘুম বস্তিতে এসে রেল থামল। হাঁসেরা অমনি হাঁক দিলে—"ঘুম লেক যাও তো নেমে পড়!" কিন্তু তখন গাড়ির ঝাঁকানিতে রিদয়ের ঘুম এসেছে, সে হাত নেড়ে জানালে—"দার্জিলিঙ যাব!" এই সময় গাড়ির মধ্যে থেকে একপাল ছেলে চেঁচিয়ে উঠল—"টু সোনাদা ঘুম!" রিদয় চমকে উঠে দেখলে গাড়ি ছেড়েছে।

ঘুমের পরেই 'বাতাসীয়া' নতুন লাইন খুলেছে—এক-একটা পাহাড় কেটে সেগুলো কেল্লার বুরুজের মতো পাথরের টালি দিয়ে পাহাড়ি মিস্ত্রি সব গেঁথে তুলেছে। রিদয়ের মনে হল, ঠিক যেন কেল্লার মধ্যে ঢুকেছি! ঠিক সেই সময় হাঁসের দল ডাক দিলে—"বাতাসীয়া বাতাস-জোর, ধরে বস!" কিন্তু গুছিয়ে বসবার আগেই রিদয়ের বাতাসে লালা ছাতার মতো উড়ে একেবারে পথের মাঝে এসে বসল। সোঁ-সোঁ করে বাঁশি দিয়ে রেল দার্জিলিঙের দিকে বেরিয়ে গেল।

পাহাড়ের মোড়টা সুনসান, লোক নেই, দূর থেকে একটা মোষের গাড়ি আসছে। রিদয় আস্তে-আস্তে সেই মোষের গাড়ি ধরে ঝুলতে-ঝুলতে দার্জিলিঙের বাজারে হাজির। হাঁসেরা মাথার উপরে ডাক দিয়ে গেল—"আলুবাড়ি গুম্ফা মনে রেখ, সেখানে আমরা রইব।" রিদয় আলুবাড়ি-আলুবাড়ি নাম মুখস্থ করতে-করতে বাজার দেখতে চলল। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে—অন্ধকারে রিদয় ভিড়ের মধ্যে মিশে চলেছে। বাজারের ওধারে কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড়ে বরফের উপর সন্ধ্যার আলো যেন সোনার মতো ঝলক দিয়ে উঠল। তারপর গোলাপী, গোলাপী থেকে বেগুনী হয়ে আবার যে শাদা সেই শাদা বরফ দেখা দিলে। সেই সময় চৌরাস্তায় গোরার বাদ্যি শুরু হল, আর দলে-দলে লোক সেইদিকে ছুটল। রাস্তার দুধারে জুতো, খাবার, বাসন, গহনার দোকান—এখানে-ওখানে ভুটিয়া লামারা মড়ার মাথার খুলি নিয়ে ঘন্টা-ডমরু বাজিয়ে নন্দি-ভৃঙ্গির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাহাড়ের রাস্তা কখনো রিদয় ভাঙেনি, দু-এক চড়াই উঠেই বেচারা হাঁপিয়ে পড়ল। কোথায় বসে জিরোয় ভাবছে, এমন সময় একটা খেলনার দোকানে নজর পড়ল, সেখানে লাল উলের মোজা পরানো ঠিক তারি মতো অনেকগুলো পুতুল সার্শির গায়ে কাগজের বাক্সোতে দাঁড়-করান রয়েছে! রিদয় চুপি-চুপি দোকানে ঢুকে একটা খালি বাক্স দেখে তারি মধ্যে শুয়ে রইল।

সার্শিমোড়া দোকানের মধ্যে বেশ গরম, এক খোট্টা বাবু বসে বিড়ি টানছেন আর একটা ভুটিয়া মেয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দোকানর মধ্যে ফুটবল পোস্টকার্ড নানা পুতুল লজঞ্চুস মার্বেল এমনি সব সাজানো, দরজার উপরটায় একটা বিভীষণের মুখোশ হাঁ করে চোখ পাকিয়ে চেয়ে রয়েছে! রিদয়

মুখোশটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে এমন সময় এক বাবু দোকানে ঢুকেই বলে উঠলেন—“ওহে মার্কণ্ড, ছোট-খাটো দুটো পুতুল দাও দেখি, টুনু আর সুরূপার জন্যে!”

মার্কণ্ড তাড়াতাড়ি রিদয় যে বাক্সে ছিল সেই বাক্সে আর একটা বিবি পুতুল দিয়ে কাগজে মুড়ে বাবুর হাতে দিলে। বাবু সেটাকে আলখাল্লার পকেটে ফেলে চুরুট ধরিয়ে পাহাড়ের রাস্তায় ঠকঠক লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে বাড়ি-মুখো হলেন। পকেটের মধ্যে গরম পেয়ে রিদয় বিবি পুতুলটির পাশে ঘুমিয়ে পড়ল, আবার যখন চোখ মেলে চাইলে তখন দেখলে বাক্সর ডালাটা খুলে গেছে। একটা কাঁচ-মোড়া বারাণ্ডায় গোটাকতক তুলি, এক বাক্স রঙ, একটা গদী-মোড়া চৌকি, তারি উপরে একটা এতটুকু কালো কুকুর বাক্স থেকে তাকে টানাটানি করে খেলবার চেষ্টা করছে! কুকুরটা যদি কামড়ে দেয় —! রিদয় ভাবছে, এমন সময় ওঘর থেকে ডাক এল “টমা-টমা-টমাসে!” কুকুরটা দৌড়ে ওঘরে গেল সেই ফাঁকে রিদয় বাক্স থেকে চোঁচা দৌড়।

বাড়ির বাইরে থেকে সার্শিতে মুখ লাগিয়ে দেখলে একটা লাল কম্বল-পাতা খাটে ছেলে মেয়ে একদল বসে তাদের বড় ভাইটির কাছে গল্প শুনছে আর একটা ছোট ছেলে লাল ভুটিয়ার কাপড় পরে যে গল্প বলছে তার গলা জড়িয়ে ডাকছে—“পাখম দাদা, পাখম দাদা!”

শীতের রাতে আগুন জ্বালা ঘরখানি—এই ছেলের দল, এই হাসি-খুশি গল্প দেখে রিদয়ের চোখে জল আসতে লাগল। তারও ঘর আছে তারও দাদা আছে, দিদি আছে, অথচ সব থেকেও নেই! কোথায় রইল তাদের আমতলি, কোথায় সেই মাটির দেওয়াল ঘরগুলি! রিদয়ের প্রাণ চাইছে এই ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে খেলে, কিন্তু হায়, সে বুড়ো-আংলা যক্ হয়ে গেছে আর কি মানুষের ঘরে তার স্থান হবে! বুড়ো-আংলা জানালার বাইরে শীতে বসে অঝোরে কাঁদতে লাগল। সেই সময় বাবু ওধারে হুকুম দিলেন—“এ রবতেন কাল আলুবাড়ি যানে হোগা, ডাণ্ডি রাখ যাও!”

রবতেন ডাণ্ডিখানা জানলার ধারে বারাণ্ডায় রেখে চলে গেল। রিদয় সে রাত ডাণ্ডির ছৈটার মধ্যে কাটিয়ে বাবুর সঙ্গে লুকিয়ে যেমন এসেছিল, তেমনি ডাণ্ডিতে লুকিয়ে রওনা হল। পুতুলের মধ্যে টুনুর পুতুলটাই পাওয়া গেল, সুরূপার পুতুলটা নিশ্চয় টমা মুখে করে কোথায় ফেলেচে বলে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান হল না! সুরূপা টমার পিঠে দুই থাবড়া বসিয়ে পাহাড়ের উপর পা ছড়িয়ে কাঁদতে লাগল।

আলুবাড়ি থেকে রিদয়কে পিঠে নিয়ে জালা-পাহাড় কাট-পাহাড় পেরিয়ে হাঁসেরা এমন মেঘ আর শিলা-বিষ্টি পেলে যে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকেই এগোতে পারলে না, তাড়াতাড়ি ঘুরে ঝুপ-ঝাপ ঘুম-লেকে গিয়ে পড়ল। ভয়ঙ্কর শিল পড়েছে, লেকের জলের উপরে বরফের সর পড়ে গেছে, পাহাড়ের গা বরফে শাদা হয়ে গেছে, খোঁড়া হাঁসের পায়ের বাত কটকট করে উঠল। সে বললে—“কাজ নেই বাপু এখানে থেকে, ফিরে চল, আর একবার আসা যাবে।” কিন্তু চল বললেই বলা চলা যায় না—পাহাড় দেশে মেঘ ভালো হওয়ার গতিক বুঝে তবে চলাচল করতে হয়। কোনো রকমে পাঁপড়া পানকৌড়ি ঘুম-রকে চড়ে আকাশের ভাবটা জেনে আসতে চলল; অমনি রিদয় বললে—“আমি যাবো ঘুম-রকে।” খোঁড়া বললে—“আমিও।” অমনি সবাই একসঙ্গে—“আমিও-আমিও” বলতে-বলতে উড়ে গিয়ে রকের উপরে বসল।

মানুষের বাড়িতে যেমন কোনো জায়গা রাঁধবার, কোনটা বৈঠকখানা, কোনটা বা শোবার-খাবার জায়গা, হিমালয়েতেও তেমনি এক-একটা জায়গা এক-এক কাজের জন্যে আছে। মানুষের বাড়িত যেমন দালান থাকে বারাণ্ডা থাকে রক থাকে, হিমালয়েতেও তাই। ঘুম-রকটা হল ঘুম দেবার স্থান, জলাপাহাড় হল জল খাবার কিম্বা জলো হাওয়া খাবার জায়গা, রংটং হল ধোবিখানা, কাপড় রঙাবার জায়গা, টুং হল ঘড়ির ঘর, এমনি সব নানা রক নানা দালান চাতাল গুহা এক-এক কাজের জন্যে রয়েছে।

ঘুম-রকে দিনে বড় কেউ আসে না, দু’চার পথিক পাখি কি জানোয়ার কখনো-কখনো জিরোতে বসে, না হলে জায়গাটা সারাদিন ফাঁকা থাকে দেখে বুড়ো রামছাগল মাস্টার এখানে ছানা পড়াবার জন্যে একটা ইস্কুল খুলেছেন। পাখির-ছানা শেয়াল-ছানা শুয়োর-ছানা ভালুক-ছানারা ঘুম-রকে বড়-বড় পাথরের

বেঞ্চিতে কেউ পা ঝুলিয়ে কেউ বা বেঞ্চিতে দাঁড়িয়ে সারাদিন ঝিমোচ্ছে আর রাম-ছাগল শিংয়ের খোঁচায় তাদের জাগিয়ে দিয়ে কেবলি পড়াচ্ছেন, ক, খ, গ, ঐ ব্যে স্যে! একে ঘুম-রক তাতে আজ বড় বাদলা, শিংয়ের খোঁচা খেয়েও চুনে-চুনে পড়ছে দেখে রামছাগলও কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমের যোগাড় করছেন এমন সময় রিদয়কে নিয়ে হাঁসেরা উপস্থিত। অচেনা লোক দেখে মাস্টারমশায় তাড়াতাড়ি গা ঝাড়া দিয়ে মস্ত ম্যাপ আঁকা প্রকাণ্ড কালো সেলেটখানায় শিং বুলিয়ে-বুলিয়ে ছেলেদের জিওগ্রাফির লেকচার শুরু করলেন:

জলের জন্তুরা চোখ ফুটেই দেখে জল আকাশ, ডাঙ্গার জীব তারা দেখে বন-জঙ্গল মাঠ, আর পাহাড়ের ছেলেমেয়ে তারা দেখে আকাশের উপরে বরফে ঢাকা ওই হিমালয়ের চুড়ো ক'টা। হিম-আলয় সন্ধি করে হয়েছে হিমালয় অর্থাৎ কিনা হিমালয় মানে হিমের বাড়ি, পাহাড়ি ভাষায় বলে হিমাল, সমস্‌কৃতোতে বলবে হিমাচলম্‌, ইংরেজ তারা ভালো রকম উচ্চারণ করতেই পারে না, 'র' বলতে 'ল' বলে ফেলে—তারা হিমালয়কে বলে ইমালোইয়াস্‌! হিমালয়ের মতো উঁচু আর বড় পর্বত জগতে নেই। সব দেশের সব পর্বত আমাদের হিমালয়ের চূড়োর কাছে হার মেনেছে।

ধলা চামড়া জানোয়ারেরা ধরাকে সরা জ্ঞান করে, আমাদের বলে কালো, কিন্তু তাদের সব চেয়ে বড় পাহাড় মোটে ষোলো হাজার ফুট আর আমাদের এই বাড়ির চূড়োগুলো কত উঁচু তা জানো? এর চল্লিশটা শিখর হচ্ছে চব্বিশ হাজার ফিট করে এক-একটি। ঐ কাঞ্চনজঙ্ঘা যেটা সকালে-সন্ধ্যায় সোনা আর দিনে-রাতে রুপো, ওটা হচ্ছে আটাশ হাজার ফুট, ওরও আরো হাজার ফুট উপরে ধবলগিরির সব উঁচু চূড়ো ঊনত্রিশ হাজার ফুট। এর পাশে ধলা চামড়াদের জেতো পাহাড়—ফুঃ, রাজহস্তীর পাশে খরগোস! মানুষের কথা দূরে থাক পাখিরাও এই হিমালয়ের চূড়োয় চড়তে পারে না, এখানে না ঘাস না গাছ! মেঘ পর্যন্ত ভয় পায় সেখানে উঠতে, শুধু ধপধপ করছে আছোঁয়া শাদা বরফ।

এই হিমালয়ের চূড়ো থেকে বরফ গলে বারোটা মহানদী ছিষ্টি হয়ে পুব-পশ্চিমে দুই মহাসাগরে গিয়ে পড়েছে, কত দেশ কত বনের মধ্যে দিয়ে তার ঠিক নেই। এ-সব নদীর ধারে কত নগর কত গ্রাম কত মাঠ-ঘাট জমি-জমা রাজ্য পেতে কত রকমের মানুষরা রয়েছে তা গোনা যায় না।

এই হিমের বাড়ির চূড়োটা থেকে ধাপে-ধাপে পৃথিবীর দিকে নেমে গেছে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পর্বত-প্রমাণ সিঁড়ি, এক-এক ধাপে রকম-রকম গাছ-পালা পশু-পাখি! এ রকে সে রকে পাথরের কাজাল এমন চওড়া যে সেখানে কতকালের পুরোনো পাথরের মেঝেতে বড়-বড় গাছের বন হয়ে রয়েছে, ঝরনা দিয়ে বর্ষার জল বরফের জল সব গড়িয়ে চলেছে। কোনো রকের উপর দিয়ে মানুষেরা রেল চালিয়ে দিয়েছে, বড়-বড় শহর বসিয়ে বাজার বসিয়ে রাজত্ব করছে।

জীব-জন্তুর অগম্য স্থান ধবলাগিরি, সেখানে কেবলই বরফ। এই সিঁড়ির রক, যাতে আমরা বাস করছি, এরি সব উপরের রকে শুধু বরফ আর শেওলা, একমাত্র চমরী গাই পাহাড়ি ছাগল আর ভেড়া, তার পরের ধাপে মানুষ-সমান ঘাস আর দেবদারু বন, সেখানে শেয়াল ভালুক হেঁড়েল এরাই যেতে পারে, তার পরের রকে নানা ফুল ফলের বাগান, সেখানে প্রজাপতি পাখি খরগোস কুকুর বেড়াল ভোঁদড় ভাম বাঁদর হনুমান এরাই থাকে, সবশেষের ধাপে বেতবন বাঁশবন অন্ধকার ঘন জঙ্গল, সেখানে হরিণ মোষ বাঘ সাপ ব্যাঙ্‌ তার পরে চাটালো জমি যার উপর দিয়ে সহস্রধারা নদী সব বয়ে চলেছে, এরি পরে অগাধ সমুদ্র, নীল জল, শেষ দেখা যায় না, এই সমুদ্রের ওধারে যে কি, তা কেউ জানে না!

চকা আমনি বলে উঠল—"আমি জানি। নীল সমুদ্রের মাঝে পাহাড় আছে, টাপু আছে, তার পরে পৃথিবীর শেষ বরফের দেশ, সেখানে বারোমাস বরফ, জমি যেন শাদা চাদরে ঢাকা আর সেখানে ছ'মাস রাত্রি ছ'মাস দিন; সেখানে পেঙ্গু পাখিরা বরফের বাসায় ডিম পাড়ে, ধলা ভালুক আছে, ধলা শেয়াল সিন্ধুঘোটক আছে, সব সেখানে শাদা, কালো কিছু নেই, দিন রাত সমান আলো, ঘুটঘুটে আঁধার মোটেই নেই, আমি সেখানে পাঁচবার গেছি!"

চকার কথায় রামছাগল শিং বেঁকিয়ে বল্লে—"এত বুড়ো হলেম এমন আজগুবি কথা তো শুনিনি।"

রিদয় এবার এগিয়ে এসে বললে—"যে হিমালয়ের চূড়ো এখান থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বরফে ঢাকা, ঐ হিমের বাড়ি গড়া নিয়ে কি কাণ্ড হয়ে গেছে এককালে, তার খবর চকা তো জানে না, রামছাগলও

জানে না, মানুষেরা ধ্যান করে ওই নিচের তলাকার বনে বসে। ওই ধবলগিরির উপরের খবর যা শাস্তরে লিখে গেছে—তাই বলছি, শোনো। বড় চমৎকার কথা!"

সবাই অমনি রিদয়কে ঘিরে বসল কথা শুনতে, মেঘলা দিন ভিজে স্যাঁৎস্যাঁত করছে, ভালুকের গা ঘেঁষে ছাগল, ছাগলের গা ঘেঁষে হাঁস, হাঁসের গা ঘেঁষে শেয়াল।

রিদয় গল্প শুরু করলে:

হিমালয় কেমন, তা শুনলে! হিমালয়ের উপরে কি নিচে কি সমুদ্রের এপারে কি ওপারে কি সবই তো শুনলে, কিন্তু এগুলো তৈরি করলে কে, তার খবর রাখ? প্রথমে সেইটে বলি, শোনো—একদিন বিশ্বকর্মা গোলার মতো একতাল কাদা পাকিয়ে নতুন পৃথিবী গড়তে বসলেন। চন্দ্র সূর্য গড়া হয়েছে এইবার সসাগরা আমাদের এই ধরা তিনি গড়তে আরম্ভ করলেন। সেদিনটাও এমনি আঁধার-আঁধার ছিল। বিশ্বকর্মার আর কাজে মনই যাচ্ছে না, তিনি কাদা নিয়ে কেবলি পৃথিবীটার উপরে বুড়ো আঙুলের টিপ দিয়ে এদেশ-সেদেশ গড়ে চললেন, সব দেশ মিলিয়ে দেশ-বিদেশগুলোর চেহারাটা হল ঠিক যেন হাড্ডিসার—এখানে-ওখানে মাটি-ঝরা শিক-বারকরা বাঁকা-চোরা টোল-খাওয়া দোমড়ানো চোপসানো গরু, ঘাড় ঝুঁকিয়ে সমুদ্রের জল খাচ্ছে আর ঠিক তারি সামনে একটা গরুড় পক্ষীর ছানা সেও যেন গো-ডিম থেকে সবে বার হয়ে মাছ ধরবার জন্যে সমুদ্রের দিকে গলা বাড়িয়েছে!

বিশ্বকর্মার পাশে বিশ্বামিত্র বসেছিলেন; তাঁর বিশ্বাস, বিশ্বকর্মার চেয়ে গড়ন-পিটন করতে তিনি পাকা। বিশ্বকর্মার সঙ্গে বাজি রেখে প্রায়ই বিশ্বামিত্র এটা-ওটা গড়তেন, প্রত্যেক বারে বাজিও হারতেন কিন্তু তবু তাঁর বিশ্বাস গেল না যে বিশ্বকর্মার চেয়ে তিনি পাকা কারিগর! বিশ্বকর্মার ছিষ্টি মিষ্টি আতা খেয়ে বিশ্বামিত্র এক আতা গড়লেন, দেখতে বিশ্বকর্মার আতার চেয়েও ভালো কিন্তু সমুদ্রের জল দিয়ে গড়বার কাদা ছানার দরুন বিশ্বামিত্রের আতা এমনি নোনা হয়ে গেল যে মুখে দেবার যো নেই! ডিম ফুটে পাখি বেরোচ্ছে বিশ্বকর্মা ছিষ্টি করলেন, পাখিদের মা-বাপ— তাদের ডিম, ডিমের মধ্যে বাচ্চা—বিশ্বামিত্র বললেন, 'ও কি হল? এ কি আবার একটা ছিষ্টি! আমি গাছে পাখি ফলাব।' বিশ্বামিত্র অনেক মাথা ঘামিয়ে অনেক আঁক-জোক কষে স্থির করলেন—ডিমে তা দেওয়া চাই কিন্তু পাখি তা দিলে তো চলবে না—তিনি এমন নারকোল গাছ সুপুরি গাছ তাল গাছ ছিষ্টি করলেন যাতে দিন ভোর রোদ পায়, কিন্তু বেশি রোদ পেলে ডিম একেবারে সিদ্ধ হয়ে যাবে, আবার রাতে হিম পেলেও নষ্ট হবে, জল পেলে পচে যাবে! সব ভেবে-চিন্তে বিশ্বামিত্র বড়-বড় পাখির পালকের মতো পাতা গাছের আগায় বেঁধে দিয়ে সেই পাতার গোড়ায় দশটা বারোটা কুড়িটা পঁচিশটা করে ছোট-বড় নানা রকম ডিম ঝুলিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন পাখি বার হয়, কিন্তু পাছে কাগে চিলে ঠুকরে ডিমগুলো ভেঙে দেয় সেজন্যে বিশ্বামিত্র ডিমের খোলাগুলো এমনি শক্ত করে বানিয়েছেন যে বাচ্চা পাখি সেই পুরু নারকোল মালা নারকোল ছোবড়া তালের খোলা সুপুরির ছাল ভেঙে বার হতেই পারলে না। কোনোটা রোদে পক্ক কোনোটা অর্ধপক্ক কোনোটা অপক্কই রয়ে গেল। ডিম হল, তার শাঁস জল হল, তা দেওয়া হল, সবই হল, কিন্তু তা থেকে পাখি হল না!

এতেও বিশ্বামিত্রের চৈতন্য হল না। বিশ্বকর্মাকে গোরূপা পৃথিবী গড়তে দেখে তাঁরও গড়বার সাধ হল। তখন বিশ্বকর্মা গোরূপা পৃথিবীর বাঁটের মতো এই ভারতবর্ষটি অতি যত্ন করে গড়ছেন, সব তখনো গড়া হয়নি কিন্তু এতেই মনে হচ্ছে এই দেশটি হবে চমৎকার, একেবারে কামধনুর বাঁটের মতো দেশটি—যা চাই যত চাই এখানে পাওয়া যাবে। বিশ্বামিত্র তাড়াতাড়ি একটু কাদা নিয়ে বসে বললেন, 'দাদা তুমি খানিক এই দেশটার গড়, আমিও খানিক গড়ি—দেখা যাক কার ভালো হয়।' বিশ্বকর্মা ভারতবর্ষের আদড়াটা প্রায় শেষ করেছিলেন কাজেই বিশ্বামিত্র খারাপ করে দিলেও দেশটা একেবারে মাটি হয়ে যাবে না জেনে দেশটার উপরে বিশ্বামিত্রকে গড়া পেটা করতে দিতে বিশ্বকর্মা আপত্তি করলেন না। তাঁকে সমস্ত উত্তর দিকটা গড়তে ছেড়ে দিয়ে নিজে বাঙলাদেশটা গড়তে বসে গেলেন। বাঙলাদেশটা সুন্দর করে নদী গ্রাম ধানখেত সুন্দর বন আম কাঁঠালের বাগান খড়ের চাল দেওয়া ছোট-ছোট কুঁড়ে ঘর দিয়ে চমৎকার করে সাজিয়ে তুলতে বিশ্বকর্মার বেশি দেরি লাগল না, বুড়ো আঙুলের দু'চার টিপ দিয়ে মাঠগুলো আর আঙুলের দাগ দিয়ে নদী-নালা বানিয়ে তিনি কাজ শেষ করে বসে বিশ্বামিত্রের দিকে

চাইলেন। বিশ্বামিত্র অমনি বলে উঠলেন,—'আমার কাজ অনেকক্ষণ শেষ হয়েছে, দেখবে এস।'

বিশ্বকর্মার ছিষ্টি বাঙালাদেশ দেখে বিশ্বামিত্র এবারে নিন্দা করতে পারলেন না, চমৎকার! সুজলা সুফলা—বীজ ছড়ালেই ফসল, কোথাও উঁচু-নিচু এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়-পর্বত নেই বললেই হয়, যতদূর চোখ চলে সবুজ খেত আর জলা। বিশ্বামিত্র দাড়ি নেড়ে বললেন—'হ্যাঁ, এবারের ছিষ্টিটা হয়েছে মন্দ নয়, কিন্তু আমার দেশটা আরো ভাল হয়েছে দেখসে' বলে বিশ্বামিত্র বিশ্বকর্মাকে উত্তর-ভারতবর্ষটা কেমন হয়েছে দেখতে বললেন।

বিশ্বকর্মার আদড়া উল্‌টে-পাল্‌টে বিশ্বামিত্র গড়েছেন। পাঞ্জাবে টেনেছেন পাঁচটা নদীর খাত, কিন্তু সেখানকার জমিতে সার মাটি না দিয়ে তিনি দিয়েছেন বালি আর কাঁকর, ধানও হবে না, মানুষগুলো কেবল যেন জল খেয়েই থাকবে! তারপর পাহাড় অঞ্চলে দুজনে উপস্থিত—বিশ্বকর্মা বিশ্বামিত্রের কীর্তি দেখে অবাক! সেখানে যা পেয়েছেন পাথর সবগুলো জড়ো করে এক হিমালয় পাহাড়ের ছিষ্টি করে বসেছেন বিশ্বামিত্র। তাঁর চিরকাল মাথায় আছে সূর্যের তাপ—গাছপালা মানুষ গরু সব জিনিসের পক্ষে ভালো, কাজেই তাঁর ছিষ্টি-করা পাহাড় দেশ তিনি যতটা পারেন সূর্যের কাছে ঠেলে তুলেছেন আর সেই সব পাথরের গায়ে এখানে-ওখানে দু'চার মুঠো মাটি ছড়িয়ে দু'একটা ঘাসের চাপড়া লাগিয়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসেছেন!

বিশ্বামিত্র একগাল হেসে যেমন বলেছেন, 'কেমন দাদা, ভালো হয়নি?' অমনি ঝুপঝুপ করে এক পশলা বিষ্টি নামল আর পাহাড়ের সব মাটি ঘাস ধুয়ে গিয়ে খালি পাথর আর নুড়ি বেরিয়ে পড়ল। এদিকে পাহাড়ের এখানে-ওখানে উপরে নিচেয় এত বিষ্টির জল জমা হল যে তাতে সারা পৃথিবীর নদীতে জল দেওয়া চলে!

বিশ্বকর্মা বলে উঠলেন—'করেছ কি, সব উল্‌টো-পাল্‌টা! যেখানে মাটি চাই, সেখানে দিয়েছ কাঁকর, যেখানে জল দরকার সেখানে দিয়েছ বালি, আর যেখানে জল মোটেই দরকার নেই সেখানে জমা করেছ রাজ্যের জলাশয়, তোমার মৎলব তো কিছু বোঝা গেল না!'

বিশ্বামিত্র দাড়ি মোচড়াতে-মোচড়াতে বললেন—'শীতে যাতে লোক কষ্ট না পায় তাই দেশটা যতটা পারি সূর্যের কাছে দিয়েছি, এতে দোষটা হল কি!'

বিশ্বকর্মা বললেন—'উঁচু জমিতে দিনে যেমন গরম রাতে তেমনি ঠাণ্ডা, এটা তো তোমার মনে রাখা উচিত ছিল, এত উঁচুতে তো কিছু গাছপালা গজানো শক্ত, গরমে জ্বলে যাবে বরফে সব জমে যাবে। এত পরিশ্রম তোমার সব মাটি হল, দেখছি!'

বিশ্বামিত্র মাথা চুলকে বললেন—'আমি সব এখানকার উপযুক্ত মানুষ ছিষ্টি করে দিই। তারা দেখবে এই পাহাড়কে ভূস্বর্গ করে তুলবে!'

বিশ্বকর্মা বললেন—'আর তোমার ছিষ্টি করে কাজ নেই, মানুষ গড়তে শেষে বাঁদর গড়ে বসবে!'

'কোনো ভয় নেই, আবার আমি খুব সাবধানে গড়ছি। দেখ এবারে ঠিক হবে'—বলে বিশ্বামিত্র একরাশ প্রজাপতির ডানা গড়ে রেখে বিশ্বকর্মাকে ডেকে বললেন—'দেখসে মজা!'

বিশ্বকর্মা ভেবেই পান না, এত ডানা নিয়ে বিশ্বামিত্র কি করবেন! তিনি শুধোলেন—'এগুলো কি হবে ভাই?'

বিশ্বামিত্র খানিক কপালে আঙুল বুলিয়ে চিন্তা করে বললেন—'পাহাড়দের সব ডানা দিয়ে দিতে চাই, তারা যেখানে খুশি—শীতের সময় গরমদেশে, গরমের সময় শীতদেশে, উড়ে-উড়ে বিচরণ করতে পারবে, তা হলে এখানে যারা বাস করবে তাদের আর কোনো অসুবিধে হবে না!'

বিশ্বকর্মা ভয় পেয়ে বলে উঠলেন—'সর্বনাশ, পাহাড় যেখানে-সেখানে উড়ে বসতে আরম্ভ করলে যে-সব দেশে পাহাড়-পর্বত গিয়ে পড়বে, সে-সব দেশের দশা হবে কি? লোকগুলো-সুদ্ধ সারা-দেশ যে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে!'

বিশ্বামিত্র বলে উঠলেন—'তা কেন! লোকেরা সব ধন-দৌলত খাবার-দাবার নিয়ে পাহাড়ে চড়ে বসবে, তা হলেই কোনো গোল নেই!' বিশ্বকর্মা বললেন—'সবাই পাহাড়ে চড়ে ঘুরে বেড়ালে আমার জমিতে হাল দেয় কে, রাজত্বই বা করে কে, ঘর-বাড়িই বা বেঁধে থাকে কে!'

'তা আমি কি জানি'—বলে বিশ্বামিত্র হিমালয়ের ডানা দিতে যান, এমন সময় বিশ্বকর্মা তার হাত চেপে ধরে বললেন—'আগে হিমালয়ের বাচ্ছা এই ছোট-খাটো মন্দর পর্বতটাকে ডানা দিয়ে দেখো, কি কাণ্ড হয়, পরে বড়টাকে নিয়ে পরীক্ষা কর।'

বিশ্বামিত্র মন্দর পর্বতে ডানা দিয়ে যেমন ছেড়ে দেওয়া, সে অমনি উড়তে-উড়তে বাঙলাদেশের দক্ষিণ ধারে যে-সব দেশ গড়া হয়েছিল সেইখানে উড়ে বসল! যেমন বসা অমনি সারাদেশ রসাতলে তলিয়ে গেল; মাটি যেখানে ছিল সেখানে একটা উপসাগর হয়ে গেছে দেখা গেল। মানুষ যারা ছিল তাদের চিহ্ন রইল না, কেবল মাছগুলো জলে কিল-বিল করতে লাগল, আর মন্দর পর্বতটা সমুদ্র তোলপাড় করে এমনি সাঁতার কাটতে আরম্ভ করলে যে, জল-প্লাবনে বিশ্বকর্মার ছিষ্টি মাটি ধুয়ে যাবার যোগাড়!

বিশ্বকর্মা তাড়াতাড়ি সমুদ্রের ধারে-ধারে বালির বাঁধ দিয়ে জল ঠেকিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললেন—'আমার হাতের কাজে তোমায় আর হাত দিতে দিচ্ছিনে। এই পৃথিবীর উত্তর শিয়র আর দক্ষিণ শিয়রে কিছু নেই, কিছু ছিষ্টি করতে হয় সেই দু'জায়গায় করগে। যে ভুলগুলো করেছ সেগুলো আমাকে শুধরে নিতে দাও এখন।' বিশ্বামিত্রের হাত থেকে বিশ্বকর্মা গড়বার যন্তর-তন্তর কেড়ে নিয়ে পাহাড়ে যত জল জমা হয়েছিল, সমস্ত নালা কেটে ঝরনা দিয়ে সমুদ্রের দিকে বইয়ে দিলেন। বিশ্বকর্মার ছিষ্টিতে কিছু বাজে থাকবার যো নেই, নষ্টও হবার যো নেই—পাহাড়ের জল সমুদ্রে পড়ে, সেখান থেকে সূর্যের তাপে মেঘ হয়ে আকাশ দিয়ে দেশবিদেশে বিষ্টি দিয়ে খেতে-খেতে ফসল গজাতে চলল!

বিশ্বকর্মা ইন্দ্রকে বললেন—'বাজ দিয়ে মন্দর পর্বতের ডানা কেটে দাও!' ডানা কাটা গেল, মন্দর সমুদ্রেই ডুবে রইল আর তার ডানার কুচিগুলো এখানে-ওখানে সমুদ্রের মাঝে টাপুর মতো ভাসতে লাগল। বিশ্বকর্মা সেগুলোর উপরে মাটি ছড়িয়ে দিলেন, বসতি বসিয়ে দিলেন। তারপর বিশ্বামিত্র যত ডানা গড়ে রেখেছিলেন সেগুলো দিয়ে বিশ্বকর্মা প্রজাপতি ভোমরা মৌমাছি সব গড়ে ছেড়ে দিলেন। তারা দেশ-বিদেশ থেকে ফুলের রেণু ফুলের মধু এনে পাহাড়ে-পাহাড়ে বাগান বসাতে শুরু করে দিলে। দেখতে-দেখতে পাথরের গায়ে সব ফুল গজাল ফল ফলল। সব ঠিক করে বিশ্বকর্মা প্রকাণ্ড দুই ডানা দিয়ে দক্ষ প্রজাপতি ছিষ্টি করে হাত-পা ধুয়ে ভাত খেতে গেলেন, শাস্তরের ছিষ্টিতত্ত্ব তো এই হল, তারপর দক্ষ প্রজাপতির কথা পুরাণে লিখেছে যেমন, বলি, শোনো—

বিধির মানস সুত দক্ষমুনি মজবুত

প্রসূতি তাহার ধর্ম-জায়া।

তার গর্ভে সতীনাম অশেষ মঙ্গলধাম

জনম লভিলা মহামায়া।

নারদ ঘটক হয়ে নানামতে বলে কয়ে

শিবেরে বিবাহ দিল সতী।

নারদ তো ঘটকালি নিয়ে সরে পড়লেন, এদিকে শিব ষাঁড়ে চড়ে ভুটিয়ার দলের সঙ্গে ডমরু বাজিয়ে জটায় সাপ জড়িয়ে হাড়মালা গলায় ঝুলিয়ে নাচতে-নাচতে হাজির।

দক্ষ প্রজাপতি বরের চেহারা দেখেই চটে লাল—

শিবের বিকট সাজ

দেখি দক্ষ ঋষিরাজ

বামদেবে হৈল বাম-মতি।

সেই থেকে জামাই শ্বশুরের মুখ দেখেন না। দক্ষ প্রজাপতিও শিবনিন্দে না করে জল খান না। এই সময়ে দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ করলেন; সব দেবতা নেমন্তন্ন পেলেন। সতীর বোনেরা গয়না-গাটি পরে পালকি চড়ে শিবের বাড়ির সামনে দিয়ে ঝমর-ঝমর করতে-করতে বাপের বাড়ি মাছের মুড়ো খেতে চলল দেখে সতীর চোখে জল এল। দুঃখী বলে বাবা তাঁদের নেমন্তন্ন পাঠাননি!

সতী বোনেদের পালকির কাছে গিয়ে দিদির গলা ধরে কেঁদে বললেন:

অশ্বিনীদিদি! আমারে দুখিনী দেখিয়া পিতে

অবজ্ঞা করিয়া যজ্ঞে আজ্ঞা না করিলেন যেতে,

নিজ বাপ নহে অন্য শুনে হৃদে এই ক্ষুণ্ণ

আমা ভিন্ন নেমন্তন্ন করেছেন এই ত্রিজগতে।

অশ্বিনীদিদি আঁচলে সতীর চোখের জল মুছিয়ে বললেন—'তুই চল না। বাপের বাড়ি যাবি তার আবার নেমন্তন্ন কিসের? আয় আমার এই পালকিতে!'

সতী ঘাড় নেড়ে বললেন—'না ভাই—তিনি রাগ করবেন!'

'তবে তুই তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পরে আয়'—বলে সতীর দিদিরা—

চতুর্দোলে সবে চড়ি চলিলেন হরষে

হেথায় শঙ্করী ধেয়ে করপুটে দাণ্ডাইয়ে

চরণে প্রণতি হয়ে কহিলেন গিরিশে

আমি বাপের বাড়ি যাব!

শিব বললেন—

'সতী তুমি যেতে চাচ্ছ বটে,

পাঠাইতে না হয় ইচ্ছা দক্ষের নিকটে।

আমাদের শ্বশুর জামায়ে কেমন ভাব, শোনো—

আমাদের ভাব কেমন জামাই শ্বশুরে, যেমন দেবতা আর অসুরে,

যেমন রাবণ আর রামে, যেমন কংস আর শ্যামে,

যেমন স্রোতে আর বাঁধে, যেমন রাহু আর চাঁদে,

যেমন জল আর আগুনে, যেমন তেল আর বেগুনে,

যেমন পক্ষী আর সাত নলা, যেমন আদা আর কাঁচকলা,

যেমন ঋষি আর জপে, যেমন নেউল আর সাপে,

যেমন ব্যাঘ্র আর নরে, যেমন গোমস্তা আর চোরে,

যেমন কাক আর পেচক, যেমন ভীম আর কীচক।

দক্ষ যখন অমান্য করে বারণ করেছেন নিমন্ত্রণ, কেমন করে সেখানে তোমার যাওয়া হয়!'

সতী কিন্তু শোনেন না শিবের কথা, তিনি সেজেগুজে নন্দীকে সঙ্গে নিয়ে মহাদেবের ষাঁড়ে চড়ে বাপের বাড়ি চললেন দুঃখিনী বেশে। কুবের দেখে বাক্স-ভরা এ-কালের সে-কালের গহনা এনে বললে—'মা, এমন বেশে কি যেতে আছে! বাপের বাড়ির লোকে বলবে কি—ওমা, একখানা গয়নাও দেয়নি

জামাই!' সতী কুবেরের দেওয়া গহনা পরে সাজলেন; কিন্তু দক্ষ প্রজাপতির কন্যা সতী এমন সুন্দরী যে সোনা হীরে তাঁর সোনার অঙ্গের আলোর কাছে টিম-টিম করতে লাগল। 'দূর ছাই' বলে সতী সেগুলো ফেলে দিয়ে পাহাড়ি ফুলের সাজে সেজে বার হলেন। ত্রিলোক সতীর চমৎকার বেশ দেখে ধন্য-ধন্য করতে-করতে সঙ্গে চলল।

এদিকে ছোট মেয়ে সতী এল না, কাজের বাড়ি শূন্য ঠেকছে, সতীর মা কেবলি আঁচলে চোখ মুচছেন এমন সময় দাসীরা এসে প্রসূতিকে খবর দিলে—'ওমা তোর সতী এলো ঐ!' এই শুনে—

রানী উন্মাদিনী-প্রায়

কৈ সতী বলিয়া অতি বেগে তথা ধায়।

অম্বিকারে দৃষ্টি করি বাহিরেতে এসে

আয় মা বলে লইয়া কোলে

নয়ন জলে ভাসে!

সতী মায়ের কাছে বলে একটু দুধ সন্দেশ খেয়ে সভা দেখতে চললেন। ইন্দ্র চন্দ্র সব বসেছেন, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ সব বসেছেন দক্ষ প্রজাপতিকে ঘিরে, আর কালোয়াত সব গান-বাজনা করছে—

ধির্ কুট্ কুট্ তানা নানা তাদিম তা, তা দিয়ানা ঝেন্না ঝেন্না

নাদেরে দানি তাদেরে দানি, ওদেরে তানা দেরে তানা

তাদিম তারয়ে তারয়ে দানি।

দেতারে তারে দানি ধেতেনে দেতেনে নারে দানট।

বেশ গান-বাজনা চলেছে—এমন সময় সভাতে সতীকে আসতে দেখেই দক্ষ শিব নিন্দে শুরু করলেন। দক্ষ প্রজাপতি :

কেবল এ গ্রহ আনি নারুদে ঘটালে,

কনিষ্ঠা কন্যাটা আমি দিলাম জলে ফেলে;

বস্ত্রবিনা বাঘছাল করে পরিধান,

দেবের মধ্যে দুঃখী নাই শিবের সমান।

ভূত সঙ্গে শ্মশানে-মশানে করে বাস,

মাথার খুলি বাবাজীর জল খাবার গেলাস!

যায় বলদে বসে গলদেশে মালাগুলো সব অস্থি,

সিদ্ধি ঘোঁটার সদাই ঘটা বুদ্ধি সেটার নাস্তি;

অদ্ভুত সঙ্গেতে ভূত গলায় সাপের পৈতে,

তারে আনিলে ডেকে হাসিবে লোকে—তাই হবে কি সইতে!

পাগলে সম্ভাষা করা কোন প্রয়োজন,

সাগরে ফেলেছি কন্যা বলে বুঝাই মন।

দক্ষের শিব-নিন্দা শুনে সতী আর সইতে পারলেন না।

পতি-নিন্দা শুনি সতী জীবনে নৈরাশ,

ঘন-ঘন চক্ষে ধারা সঘনে নিশ্বাস;

পিতারে কুপিতা হইয়া অঙ্গ অবসান,

ধরা শয্যা করি ‘তারা’ ত্যেজিলেন প্রাণ!

সতী শিব-নিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ করলেন, চারদিকে হাহাকার উঠল। সতীর সাতাশ বোন আকাশের তারা সব কাঁদতে লাগল, নন্দী কাঁদতে লাগল, ভৃঙ্গী কাঁদতে লাগল, দেবতারা কাঁদতে লাগলেন, মানুষেরা কাঁদতে লাগল—

ফিরে চাও মা বাঁচাও পরাণী,

ধূলাতে পতিত কেন পতিত-পাবনী;

দুটি নয়ন-তারা মুদিয়া তারা—

অধরা কেন ধরাসনে!

নন্দী গিয়ে কৈলাসে মহাদেবকে খবর দিলে—‘মা আর নেই।’ তখন শিব ক্রোধে হুহুঙ্কার ছাড়লেন, অমনি শিবদাস সব দক্ষযজ্ঞ নাশ করতে আগুয়ান হল। মহাদেব যুদ্ধে চললেন, পৃথিবী কাঁপতে থাকল, মেঘ সব গর্জন করে উঠল, আকাশে বিদ্যুৎ বাজ ছুটোছুটি করতে থাকল কড়মড় করে, শিব ত্রিশূল হাতে সাজলেন—

মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে,

ভবম্বব ভবম্ভম সিঙ্গা ঘোর বাজে;

ফণাফণ ফণাফণ ফণী ফন্ন গাজে

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে;

ধকধ্বক ধকধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে,

ববম্বম ববম্বম মহাশব্দ গালে;

ধিয়াতা ধিয়াতা ধিয়া ভূত নাচে

উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে।

চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী

মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী,

চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে

চলে শাঁখিনী পেতিনী মুক্ত কেশে।

ভূত-প্রেত নিয়ে শিব এসে উপস্থিত। ভয়ে কারু মুখে কথা নেই, মহাদেব হুকুম দিলেন ভূতিয়া ফৌজকে—যজ্ঞনাশ কর। অমনি—

রুদ্রদূত ধায় ভূত নন্দি ভৃঙ্গি সঙ্গিয়া

ঘোরবেশ মুক্ত কেশ যুদ্ধ রঙ্গ রঙ্গিয়া,

যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে

যজ্ঞগেহ ভাঙ্গি কেহ হব্যগব্য খাইছে,

প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে,

ঘোররোল গণ্ডগোল চৌদ্দলোক কাঁপিছে ;

ভূত ভাগ পায় লাগ লাথি কিল মারিছে

বিপ্র সর্ব দেখি খর্ব ভোজ্য বস্ত্র সারিছে

ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়ি গোঁফ ছিণ্ডিল

পুষণের ভূষণে দন্ত পাঁতি পড়িল,

ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্ত কেশ ধায় রে,

হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দায় রে!

নৈবিদ্যির থালা ফেলে বিশ্বামিত্র দৌড়—বশিষ্ঠ চম্পট, সবার দাড়ি গোঁফ ছিঁড়ে কিলিয়ে দাঁত ভেঙে ভূতেরা লম্ফ-ঝম্প করতে লাগল—

মৌনী তুণ্ড হেঁট মুণ্ড দক্ষ মৃত্যু জানিছে

মৈল দক্ষ, ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।

দক্ষ-নিপাত দেখে সতীর মা কেঁদে শিবকে বললেন—

সতীর জননী আমি, শাশুড়ী তোমার,

তথাপি বিধবা দশা হইল আমার?

প্রসূতির বাক্যে শিব সলজ্জ হইল,

রাজ্যসহ দক্ষরাজে বাঁচাইয়া দিল।

ধড়ে মুণ্ড নাহি দক্ষ দেখিতে না পায়,

উঠে পড়ে ফিরে ঘুরে কবন্ধের প্রায়—

কন্দ-কাটা দক্ষের দুর্গতি দেখে ভূতেরা সব হাসতে লাগল, তখন শিবের হাতের কাছে ছিল পাহাড়ি একটা রামছাগল দড়ি দিয়ে হাড়-কাঠে বাঁধা। তিনি সেইটে নন্দীকে দেখিয়ে দিলেন। নন্দী তার মুড়োটা কেটে দক্ষের কাঁধে জুড়ে দিয়ে দক্ষ প্রজাপতির ডানা দুটো কেটে নিয়ে চলে গেল, শিব সতীদেহ নিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে কৈলাসে গেলেন! এর পরে আরও কথা আছে, কিন্তু এইখানেই দক্ষযজ্ঞ শেষ—হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়—বলে রিদয় চুপ করলে।

রামছাগল ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকালে, খানিক চেয়ে থেকে বললে— "ফুঃ, এমন আজগুবি কথা তো কখনো শুনিনি। বুড়ো হয়ে শিং ক্ষয়ে গেল, এমন কথা তো কোনোদিন শুনলেম না যে প্রজাপতির মাথা হয় রামছাগলের মতো আর পাহাড়গুলোর গজায় ডানা!"

রামছাগল ছেলেদের বললেন:

ওসব বাজে কথায় বিশ্বাস কর না, বড় হয়ে মধুর সন্ধানে পেটের দায়ে তোমরা জানি দেশ-বিদেশে যাবে, এমন অনেক বাজে গল্পও তোমাদের এই দেশের পাহাড়-পর্বত নদ-নদীর নামে শুনতে পাবে। কেউ বলবে তোমার দেশ মন্দ, কেউ বলবে মন্দ নয়, কিন্তু মনে রাখ, এই হিমালয়ের জলে বাতাসে তোমরা মানুষ, ভগবান তোমাদের জন্যে সব চেয়ে ভালো, সব চেয়ে উঁচু, সব চেয়ে চমৎকার বাড়ি দিয়েছেন। এই কথাটি সর্বদা মনে রেখ, কোনোদিন ভুলো না যে পৃথিবীর সেরা হচ্ছে এই হিমালয়, আর সেইটে

ভগবান দিয়েছেন তাঁর কালো ছেলেদের। এই পাথরের সিঁড়ি এতকালের পুরোনো যে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আগে এটা, তারপর গাছ পালা, জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। পাখির ছানাগুলো জন্মাবার আগে যেমন তাদের বাসা তৈরি হয়ে থাকে, মানুষদের, জানোয়ারদের জন্মাবার আগে তেমনি জগৎমাতা আর বিশ্বপিতা তাদের জন্যে এই চমৎকার হিমালয় আর সমুদ্র পর্যন্ত গেছে যে পাঁচ ধাপ পাথরের সিঁড়ি, তা প্রস্তুত করিয়েছিলেন। জীব-জন্তুরা জন্মে যাতে আরামে থাকে, কষ্ট না পায় সেই জন্যে চমৎকার করে পাথর দিয়ে দালান রক এমনি সব নানা ঘর নানা বাড়ি তাঁরা সুন্দর করে বাঁধিয়ে দিলেন!

কিন্তু কত কালের এই বাড়ি, একে পরিষ্কার রাখা, মেরামতে রাখা, যারা জন্মাতে লাগল তাদের তো সাধ্য হল না, এককালের নতুন বাড়ি পাথরের সিঁড়ি সব ভেঙে ফেটে পড়তে লাগল, বর্ষায় এখানে-ওখানে সোঁতা লাগল, শেওলা গজাল, হাওয়াতে ধুলো-মাটি এসে ধাপগুলোতে জমা হতে থাকল, ঝড়ে ভূমিকম্পে বড়-বড় পাথর খসে-খসে এখানে-ওখানে পড়ল, এখানটা ধ্বসে গেল, সেখানটা বসে গেল, ওটা ভেঙে পড়ল, সেটা বেঁকে রইল, এইভাবে কালে-কালে ধাপগুলোর উপরের তলার মাটি তাকে ধুয়ে নিচের তলায় নামতে লাগল; আর ধাপে-ধাপে সেখানে যেমন মাটি পেলে নানা জাতের গাছপালা বন-জঙ্গল দেখা দিলে। উপর-তলার মাটি ধুয়ে গেছে সেখানে কাঁকর আর নুড়িই বেশি, তার পরের ধাপে অল্প মাটি আছে সেখানে অল্পসল্প চাষবাস চলেছে দেখ, খুব ছোট-ছোট খেত, ছোট গ্রাম। মাঝের ধাপে অনেকটা মাটি জমা হয়েছে। সেখানে দেখ দর্জ্জিলিঙ শহর বাড়ি-ঘর বাজার চা-বাগান। কোম্পানীর বাগান সব বসে গেছে, উপর-তলার মতো অতটা ঠাণ্ডাও নয়, কাজেই সেখানে নানা গাছ ঝাউ বাদাম আখরোট পিচ পদম সব তেজ করেছে। নানা ফুলও সেখানে!

কিন্তু হিমালয়ের সব নিচের ধাপে যত কিছু ভালো মাটি এসে জমা হয়েছে জলে ধুয়ে একেবারে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত, সেখানে ফল-ফুলের বাগান খেতের আর অন্ত নেই, মাটিতে সেখানে এত তেজ যে, যা দাও ফলবে, আর সেখানে শীতও বেশি নয় বরফও পড়ে না, সেখানে গাছ এক-একটা যেন একখানা গ্রাম জুড়ে রয়েছে, আর চারিদিকে আম-কাঁঠালের বন!

পাহাড়ে বরফ পড়লে আমি ইস্কুল বন্ধ করে সেখানে চরতে যাই, নিজের চোখে দেখে এসেছি যা, তাই বলছি। ঋষিদের মতো চোখ বুজে ধ্যান করে গল্প বলবার জন্যে আমি ইস্কুল-মাস্টারি করতে আসিনি। ছাত্রগণ! চোখ দিয়ে দেখাই হল আসল দেখা, ঠিক দেখা, আর চোখ বুজে ধ্যান করে দেখবার মানে খেয়াল দেখা বা স্বপন দেখা। খেয়ালীদের বিশ্বাস কর না, তা তাঁরা ঋষিই হন, কবিই হন, যা দুই চোখে দেখছি তাই সত্যি, তাছাড়া সব মিছা, সব কল্পনা, গল্পকথা, খেয়াল!

রামছাগল দাড়ি নেড়ে শিং বেঁকিয়ে কটমট করে তাদের দিকে তাকাচ্ছে দেখে সুবচনীর খোঁড়া হাঁস হেলতে-দুলতে এগিয়ে এসে বললে—"ছাত্রগণ, তোমাদের মাস্টার যা বললেন, ঠিক, চোখে না দেখলে কোনো জিনিস বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু এই পাহাড় পর্বত কুয়াশায় যখন দেখা যায় না, তখন কি বলতে হবে কুয়াশার মধ্যে কিছু নেই? না বলতে হবে, সূর্য চন্দ্র আকাশ ছেড়ে পালিয়েছেন। ঠিক জিনিস সব সময়ে চোখে পড়ে না, সেই জন্য এই দুই চোখের উপরে নির্ভর করে থাকি বলে আমরা কোনোদিন মানুষের সমান হতে পারব না। মানুষের মধ্যে যাঁরা ঋষি, যাঁরা কবি, তাঁরা শুধু দুই চোখে দেখলেন না, তাঁরা ধ্যানের চোখে যা দেখতে পেয়েছেন সেইগুলো ধ্যান করে কেতাবে লিখেছেন, তা পড়লে তোমরা জানতে পারবে—এই হিমালয় প্রথমে সমুদ্রের তলায় ছিল। হঠাৎ একসময় পৃথিবীর মধ্যেকার তেজ মহাবেগে জল ঠেলে আকাশের দিকে ছুটে বার হল আর তাতেই হল সব পর্বত! যে সময় পাহাড় হয়েছিল সে সময় কেউ দেখেনি কেমন করে কি হল, কিন্তু মানুষ ধ্যান করে অনুসন্ধান করে এই পাহাড়ের জন্ম যেন চোখে দেখে কেতাব লিখেছে।"

"মাস্টার মশায়ের কথায় কি কেতাবগুলো অবিশ্বাস করবে!" বলে খোঁড়া একটি সমুদ্রের শাঁখ পাহাড়ের উপর থেকে তুলে নিয়ে রামছাগলকে দেখিয়ে বললে—"হিমালয় তো এককালে সমুদ্রের গর্ভে ছিল, এই শাঁখই তার প্রমাণ!"

রামছাগল ঘাড় নেড়ে বললে—"ওকথা আমি বিশ্বাসই করিনে। নিশ্চয় কোনো পাখিতে এনে ওটাকে ফেলেছে।"

খোঁড়া বললে—"তা হয় না। সমুদ্রের একেবারে নিচেয় থাকে এই শামুক, পাখি সেখানে যেতে পারে না।"

রামছাগল তর্ক তুললে—"তবে মাছে খেয়েছে, সেই মাছ মরে ভেসে এসেছে সমুদ্রের ধারে, সেখানে পাখি তাকে খেয়ে শাঁখটা মুখে নিয়ে হিমালয়ে এনে ফেলেছে!"

খোঁড়া ঘাড় নেড়ে বললে—"তাও হয় না। সমুদ্রে যেখানে এই শাঁখ থাকত, সেখানে মাছ কেন, মানুষ পর্যন্ত যেতে পারা শক্ত!"

রামছাগল অমনি দাড়ি চুমড়ে বললে—"তবে মানুষ জানল কেমন করে এ শাঁখ সমুদ্রের তলাকার, পাহাড়ের উপরকার নয়।"

সুবচনী পাছে তর্কে হেরে যায় রিদয় তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল—"জানো না, মানুষ ডুবুরি নামিয়ে মুক্তো তোলবার সময় এই সব শাঁখ কুড়িয়ে এনেছিল ঝুড়ি-ঝুড়ি!"

রামছাগল শিং নেড়ে বললে—"ঝুড়ি থেকে তারি গোটাকতক শাঁখ হয়তো মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।" হঠাৎ সুবচনী বললে—"তা নয়" —সুবচনী আরও কী বলতে যাচ্ছে অমনি ছাগল রেগে বললে—"তা যদি নয়তো নিশ্চয় আগে শাঁখের সব ডানা ছিল, উড়ে এসেছে হাঁসেদের মতো এই পাহাড়ে"।

রিদয় অমনি বলে উঠল—"শাঁখের যদি ডানা থাকতে পারে তবে পাহাড়গুলোরও ডানা ছিল একথাই বা কেন বিশ্বাস করবে না?"

সুবচনী অমনি বলে উঠল—"আর প্রজাপতির মাথায় রামছাগলের মুখই বা না হবে কেন, তা বল!"

ভালুকে-শেয়ালে হাঁসে-ছাগলে তর্ক বেধে গেল, দেশের জানোয়ার সেই তর্কে যোগ দিয়ে চেঁচামেচি হট্টগোল বাধিয়ে দিলে।

শিকরা বহরী বাসা বাজ তুরমুতি

কাহা কুহী লগড় ঝগড় জোড়াথুতি

ঠোঁট ভেটি ভাটা হরিতাল গুড়গুড়

নানাজাতি কাক পেঁচা বাবুই বাদুড়।

সবাই মিলে তর্ক লাগিয়েছে—"যাও-যাও হুঁদি খাও!" এমন সময় গণ্ডগোল শুনে পাহাড়ের গুহা থেকে বুড়ো লামা-ছাগল বেরিয়ে এলেন—

অতি দীর্ঘকক্ষ লোম পড়ে উরু পর

নাভি ঢাকে দাড়ি গোঁফে বিশদ চামর।

ববম-বম ববম-বম বলতে-বলতে লামাকে আসতে দেখে সবাই তটস্থ, ভালোমানুষ হয়ে বসল। লামা বললেন—"তোমরা সব কি বৃথা তর্ক করছ? দেখ তর্ক কি ভয়ানক ব্যাপার, কোথায় তোমরা পড়া পড়বে, না, হাতা—হাতি বাধিয়েছ ভায়ে-ভায়ে—"

অভেদ হইল ভেদ এ বড় বিরোধ

কি জানি কাহারে আজি কার হয় ক্রোধ!

ভ্রান্তজীব অন্ত না বুঝিয়ে কর দ্বন্দ্ব,

কারো কিছু ঠিক নাই কেবল কহ মন্দ;

উভয়ের মন তোরে মন্ত্রণা আমি কই,

তর্কে নাহি মেলে কিছু গন্ডগোল বই;

শুন বাক্য গুরুবাক্য করেছে প্রামাণ্য;

একে পঞ্চ পঞ্চে এক, নাই কিচ্ছু অন্য!

লামা-ছাগল লেকচার শেষ করলেন অমনি বোকা ছাগলের দল জাতীয় সঙ্গীত শুরু করে দিলে—

জটজালিনী ক্ষুরশালিনী,

শিংঅধারিণী গো—

ঘনঘোষিণি ঘাস-খাদিনি,

গৃহ-পোষিণি গো।

চ্যোঁ ভ্যোঁ প্যোঁ পোঁ।

সেই সময় ভূমিকম্পে পাহাড় টলমল করে উঠল, অমনি হাঁসেরা রিদয়কে নিয়ে আকাশে উড়ে পড়ল। সব জানোয়ার ভয়ে লেজ গুটিয়ে চুপ হয়ে রইল। লামা-ছাগল মাঝে দাঁড়িয়ে দুলতে থাকলেন আর বলতে থাকলেন, "একি দোলায় যে, এ্যাঁ কি ভয়ানক বিয়াপার!"

রামছাগল লামার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললেন—"পর্বতটা পার্বতী-পাঠশালা-সমেত উড়বে না কি-এ্যাঁঃ!"

যোগী-গোফা



রংপো নদীটি খুব বড় নদীও নয় ম্যাপেতেও তার নাম ওঠেনি। ঘুম আর বাতাসিয়া দুই পাহাড়ের বাঁকের মধ্যে ছোট একটি ঝরণা থেকে বেরিয়ে নদীটি পাহাড়ের গা বেয়ে দু-ধারের বনের মাঝ দিয়ে নুড়ি পাথর ঠেলে আস্তে-আস্তে তরাইয়ের জঙ্গলে নেমে গেছে, নদীর দু-পার করঞ্জা টেঁপারি তেলাকুচো বৈচী ডুমুর জাম এমনি সব নানা ফল নানা ফুল গাছে একেবারে হাওয়া করা, মাথার উপরে আকাশ সবুজ পাতার ছাউনীতে ঢাকা, তলায় সরু নদীটি ঝি-ঝি করে বয়ে চলেছে! এই পাখির গানে ভোমরার গুনগুনে ফুল-ফলের গন্ধে জলের কুলকুল শব্দে ভরা অজানা এই নদীর গলি পথ দিয়ে হাঁসেরা নেমে চলেছে আবার সিলিগুড়ির দিকে। উপরে মেঘ করেছে, বনের তলা অন্ধকার। শেওলা জড়ানো একটা গাছের ডাল এক থোকা লাল ফুল নিয়ে একেবারে নদীর জলে ঝুঁকে পড়েছে, তারি উপরে লাল টুপি নীল গলাবন্ধ সবুজ কোর্তা পরে-পরে মাছরাঙা নদীতে মাছ ধরতে বসেছে

বাদলার দিনে। নদীর মাঝে একরাশ পাথর ছড়ানো; তারি কাছাকাছি এসে চকা হাঁক দিলে—“জির্‌ওবো, জির্‌ওবো।” অমনি মাছরাঙা সাড়া দিলে—“জিরোও-জিরোও।” আস্তে-আস্তে হাঁসের দল ঝরনার স্রোতে পিছল পাথরগুলোর উপর একে-একে উড়ে বসল। এমনি জায়গায়-জায়গায় জিরিয়ে-জিরিয়ে চলতে-চলতে সন্ধ্যা হয়ে এল, নিচের অন্ধকার পাহাড়ের চূড়োর দিকে আস্তে-আস্তে উঠতে আরম্ভ করলে, মনে হচ্ছে কে যেন বেগুনী কম্বলে ঘেরাটোপ দিয়ে একটার পর একটা পর্বত মুড়ে রাখছে, দেখতে-দেখতে আকাশ কালো হয়ে গেল, তারি মাঝে গোলাপী এক-টুকরো ধোঁয়ার মতো দূরের বরফের চুড়ো রাত্রের রঙের সঙ্গে ক্রমে মিলিয়ে গেল।

পাহাড়ের গলিতে অন্ধকার যে কি ভয়ানক কালো, রিদয় আজ টের পেলে, নিজেকে নিজে দেখা যায় না, কোনদিক উপর কোনদিক নিচে চেনা যায় না। কিন্তু এই অন্ধকারেও ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে রাতের পাখিরা পাহারা দিচ্ছে। এ পাহাড়ে এক পাখি হাঁকলে—“হুহু বাতাস হুহু,” ও পাহাড়ের পাখি তারি প্রতিধ্বনি দিয়ে বলে উঠল—“ঘুটঘুট আঁধার ঘুটঘুট।” দুই পাখি থামল, আবার খানিক পরে দুই পাখি আরম্ভ করলে-“জল পিটপিট তারা মিটমিট।” বোঝা গেল এখনো বিষ্টি পড়ছে, দু-একটি তারা কেবল দেখা দিয়েছে। ভালুক-ভালুকী ঝরণার পথে জল খেতে নেমেছে, তাদের চেহারা দেখা যাচ্ছে না, কেবল বলাবলি করছে শোনা যাচ্ছে—“সেঁৎ-সেঁৎ।” একটা হরিণ কিম্বা কি বোঝা গেল না হঠাৎ বলে উঠল—“পিছল।” তারপরেই পাহাড়ের গা দিয়ে একরাশ নুড়ি

গড়িয়ে পড়ল।

রাতে যে এত জানোয়ার চারদিকে ঘোরাঘুরি হাঁকাহাঁকি করে বেড়ায়, তা রিদয়ের জ্ঞান ছিল না। আঁধারের মধ্যে কত কি উসখুস করছে, খুসখাস করছে, চলছে, বলছে— কত সুরে কত রকম গলায় তার ঠিক নেই। রিদয়ের মনে হল বাতাসটা পর্যন্ত যেন বনের সঙ্গে ফুসফাস করে এক-একবার বলাবলি করে যাচ্ছে। তখন রাত গভীর ঝিঁঝিঁ পোকা বলে চলেছে ঝিমঝিম, ঝরণা বলছে ঘুম-ঘুম, রিদয়ের চোখ ঢুলে আসতে লাগল। সেই সময় দূরে শোনা গেল—"ইয়া-হু ইয়া-হু" তারপরে একবারে রিদয়ের যেন কানের কাছেই ডেকে উঠল বিকট গলার কি এক জানোয়ার—"তোফা- হুয়া তোফা-হুয়া।"

রিদয় চমকে উঠে শুনলে, কখনো এ-পাহাড়ে কখনো ও-পাহাড়ে দূরে-কাছে আগে-পাছে উপরে-নিচে যেন দলে-দলে কারা চীৎকার লাগিয়েছে—"ইয়াহু-ইয়াহু তোফা-হুয়া তোফা-হুয়া।" ভয়ে রিদয়ের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সে চকার গা ঘেঁষে শুধোলে—"একি ব্যাপার?"

চকা অমনি বললে—"চুপ-চুপ কথা কয়ো না, ডালকুত্তা শিকারে বেরিয়েছে" —বলতে-বলতে ছায়ার মতো একটা হরিণ ওপার দিয়ে দৌড়ে জলের ধারে এসে থরথর করে কাঁপতে লাগল। ঠিক সেই সময় নদীর দুই পারে শব্দ উঠল—যেন একশো কুত্তা এক সঙ্গে ডাকছে—"হুয়া-হু হুয়া-হু হুয়া-হু!" ঝপাং করে জলে একটা ছায়া লাফিয়ে পড়ল, তারপর পিছল পাথরের উপর খুরের আঁচড় বসিয়ে ভিজে গায়ে হরিণ

এসে রিদয়ের পাশে দাঁড়িয়ে জোরে-জোরে শ্বাস টানতে-টানতে কেবলি ঘাড় ফিরিয়ে চারদিকে চাইতে লাগল। চকা হরিণের ভয় দেখে বললে—“ডালকুত্তা রইল কোন পাহাড়ে তুমি এখানে ভয়ে কাঁপছ দেখি!”

রিদয় বললে—“সে কি এই পাহাড়েই তো এখনি ডাকছিল কুকুরগুলো!”

চকা হেসে বললে—“কুকুরগুলো নয়, একটা কুকুর ডাকছিল, তাও খুব দূরে। ডালকুত্তার ডাকের মজাই এই, একটা ডাকলে মনে হবে যেন দশটা ডাকছে—দূরে কাছে চারদিকে—ভয়ে কোনদিকে যাব ভেবে পাওয়া যায় না, বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। ডালকুত্তার ডাক শুনে ভয় পেয়ে ছুটাছুটি করেছ কি মরেছ। ঠিক পায়ের শব্দ শুনে কুত্তা এসে তোমায় ধরেছে, যেখানে আছ সেইখানে বসে থাক চুপটি করে, তোমার সন্ধানও পাবে না ডালকুত্তা।”

হরিণ চকার কথায় কতকটা সাহস পেলে বটে কিন্তু তখনো ভয়ে তার কান দুটো কেঁপে-কেঁপে উঠছে, এমন সময় পিছনে অন্ধকারে খেঁকশেয়াল খেঁক করে হেসে উঠল, হরিণছানাটা একলাফ দিয়ে একেবারে নদী টপকে উপরের পাহাড়ে দৌড় দিলে। চকা বলে উঠল—“কে ও খেঁকশেয়াল নাকি?”

এই পাহাড়ে যে চাঁদপুরের শেয়াল এসে উপস্থিত হবে তা চকা ভাবেনি, আর খেঁকশেয়ালও মনে করেনি হাঁসেদের দেখা পাবে সে এখানে। শেয়াল আনন্দে চিংকার আরম্ভ করলে—“হুয়া-হুয়া হুয়া-উয়া বাহোয়া ওয়া-ওয়া!”

চকা শেয়ালকে ধমকে বললে—“চুপ অত গোল করো না, এখনি ডালকুত্তা এসে পড়বে, তখন তুমিও মরবে আমরাও মরব।”

শেয়াল একগাল হেসে বললে—“এবার আমি বাগে পেয়েছি ডালকুত্তা লেলিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ব। সেদিন বড় যে হাঁসবাজি দেখানো হয়ে ছিল, এইবার শেয়ালবাজিটা দেখে নাও।” বলেই শেয়াল ডাকতে লাগল—“হুয়া-উহা হুয়া-উহা—তোদের জন্যে আমার আর দেশে মুখ দেখাবার যো নেই!”

চকা নরম হয়ে বললে—“অত চেঁচাও কেন, তুমি আগে আমাদের সঙ্গে লেগেছিলে। আমাদের দলের লুসাই আর বুড়ো-আংলা দুজনকে খেতে চেয়েছিলে, তবে না আমরা তোমায় জব্দ করেছি, আমরা তো মিছিমিছি তোমার সঙ্গে লাগতে যাইনি।”

শেয়াল দাঁত কড়মড় করে বললে—“ওসব আমি বুঝিনে, বিচার আমার কাছে নেই। বুড়ো-আংলাটিকে আমার দু-পাটি দাঁতের মধ্যে যদি হাজির করে দাও তো এবার ছাড়া পাবে, না হলে ডালকুত্তা এল বলে!”

চকা মুখে সাহস দেখিয়ে বললে—“আসুক না কুত্তা, এই ঝরনার মধ্যে পাথরের উপরে আর আসতে হয় না—জলে নেমেছে কি কুটোর মতো কোথায় তলিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। রিদয়কে আমরা কিছুতে ছেড়ে দেব না শেয়ালের মুখে, মরি সেও ভালো।” চকা খুব তেজের সঙ্গে এই কথা বললে বটে কিন্তু রিদয় দেখলে ভয়ে তার লেজের ডগাটি পর্যন্ত কাঁপছে। চকা চুপি-চুপি তাদের সবাইকে বললে—“সাবধান,

বড় গোল এবারে, যে অন্ধকার উড়ে পড়বার যো নেই, ডালকুত্তা পাকা সাঁতারু, বিষম জোরালো, ঝরনা মানবে না সাঁৎরে উঠবে। সে জলের কুমির, ডাঙ্গার বাঘ বললেই হয়। সব সাবধান, যে যার সামলে, দেখতে না পায় পাথরের সঙ্গে মিশিয়ে বস!"

হাঁস অমনি ডানায় মুখ ঢেকে গুটিসুটি হয়ে এক-এক পাথরের মতো এখানে-সেখানে চেপে বসল, কালো বুনো হাঁসের ডানার রঙে পাথরের রঙে এমন এক হয়ে গেল যে, দু-হাত তফাৎ থেকে চেনা যায় না, হাঁস কি পাথর। কিন্তু সুবচনীর হাঁস—তার শাদা রঙ অন্ধকারেও ঢাকা গেল না, সে রিদয়কে বুকের কাছে নিয়ে বললে—"দেখ ভাই এবার তোমার হাতে মরণ-বাঁচন।"

রিদয় নিজের ট্যাঁক থেকে নরুনের মতো পাতলা ছুরিটি বার করে বললে—"দেখছ তো আমার অস্তর!"

হাঁস বললে—"অস্তরে ভালো করে শান দিয়ে রাখ ভাই।"

ঠিক সেই সময় উপর থেকে একবার ডাক এল—"ইয়াহু!" তারপরেই ঝপাং করে জলে পড়ে ডালকুত্তা হাঁসের দিকে সাঁৎরে আসছে দেখা গেল। শেয়ালটা ঝোপের আড়াল থেকে চেঁচিয়ে উঠল—"হুয়া-হুয়া হত্যা হুয়া!"

শেয়াল দেখলে, কুত্তা জল থেকে একটা বাঁকা-নখওয়ালা লাল থাবা শাদা হাঁসটির দিকে বাড়িয়ে দিলে। হাঁসটা কখন ক্যোঁক করে ওঠে শেয়াল ভাবছে ঠিক সে সময় ডালকুত্তা "উঁয়াহুঃ" বলে ডিগবাজি খেয়ে জলে পড়ে হাবুডুবু খেতে-

খেতে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ওপারে উঠল, আর ডানা ঝটপট করে হাঁসের দল অন্ধকার দিয়ে একদিকে উড়ে পালাল।

শেয়ালের ইচ্ছে হাঁসের পিছনে তাড়া করে চলে, কিন্তু ব্যাপারটা হল কি সেটা জানতে তার লোভ হচ্ছে, সে ওপর থেকে ডালকুত্তাকে ডাক দিয়ে শুধোলে—"ক্যায়াহুয়া ক্যোয়া-হুয়া?"

রিদয়ের নরুনের ঘায়ে তখন ডালকুত্তা অস্থির! সে রেগে বললে—"চোপরাও যাও-যাও!"

শেয়াল বললে—"কি দাদা হাত ফসকে গেল নাকি?"

কুত্তা গা ঝাড় দিয়ে বললে—"শাদা হাঁসটাকে টেনে নিয়েছিলুম আর কি, কি জানি সেই সময় টিকটিকির মতো একটা কি জানোয়ার হাতে এমন দাঁত বসিয়ে দিলে যে, চোখে আমি সরষে-ফুল দেখলুম!" কুত্তা তার থাবা চাটতে বসে গেল।

শেয়াল "হাঃ-গিয়া হাঃ-গিয়া" বলে কাঁদতে-কাঁদতে হাঁসেদের সঙ্গে আবার দৌড়ল। হাঁসের রিদয়কে নিয়ে দুই পাহাড়ের গলির মধ্যে দিয়ে কেবল কুলকুল জলের শব্দটি ধরে এঁকে-বেঁকে উড়ে চলেছে অজানা জায়গায়, কোথায় গিয়ে বসে ঠিক পাচ্ছে না, এমন সময় মেঘ কেটে আকাশে চাঁদ উঠল, তখন আর চকাকে পায় কে, ঝকঝকে সরু সাপের মতো নদীর ধারাটির উপরে চোখ রেখে চকা হাঁসের দলকে নিয়ে সোজা নিচ মুখে নেমে চলল। সিনিবালি চা-বাগানের উপরটায় এসে নদী একটা বড় পাথর ঘুরে ঝরনা দিয়ে একেবারে দুশো হাত নিচে পড়েছে, চাতালের মতো সেই পাথরে এসে চকা দলবল

নিয়ে বাকি রাতটা কাটাতে বসল।

ঝরনার একদিকে ধাপে-ধাপে চা-বাগান পাহাড়ের চুড়ো পর্যন্ত সিঁড়ির মতো উঠে গেছে, আর একদিকে বনের ধারে চা-বাগানের মালিকের ঘরবাড়ি, সেখান থেকে পাকদণ্ডি নেমেছে ঝরনা পর্যন্ত। হাঁসেরা রাতে এখানে-ওখানে উড়ে হাঁপিয়ে পড়েছিল, সবাই তারা ঘুমিয়ে পড়ল, রিদয় কেবল জেগে পাহারা দিতে লাগল।

খানিক রাতে বনের মধ্যে একটা ঝটাপট শব্দ শোনা গেল, তারপরেই রিদয় দেখলে ডালকুত্তার সঙ্গে শেয়াল কি ফুসফাস করতে-করতে পাকদণ্ডি দিয়ে নামছে, অন্ধকারে দুজনের চোখ আগুনের মতো জ্বলছে। রিদয় তাগ করে একটা পাথর কুচি ছুঁড়ে শেয়ালটাকে মারতে যাবে ঠিক সেই সময় একটা পাহাড়ি সাপের গায়ে তার হাত পড়ল, ঠাণ্ডা যেন বরফ! রিদয় একেবারে হাঁসের পিঠে লাফিয়ে উঠে বললে—“পালাও-পালাও, শেয়ালটা এবারে আমাদের সাপে খাওয়াবার মৎলব করেছে।”

হাঁসেরা একেবারে ডানা মেলে আকাশে যেমন লাফিয়ে উঠল, ঠিক সেই সময় পাথরের হাতুড়ির মতো পাহাড়ি সাপের মাথাটা সোঁ করে তাদের পায়ের নিচে দিয়ে ছুটে এসে পাথরে ছোবল দিলে। চকা শিয়ালের উপর ভারি চটেছে, নদীর উপর দিয়ে গেলে শেয়ালটা সহজে তার সঙ্গ ছাড়বে না বুঝে চকা এবারে একেবারে উপর দিয়ে উড়ে চলল, সোজা সিলিগুড়ির স্টেশনের টিনের ছাতের দিকে।

দার্জিলিঙ মেল আসতে এখনো তিন ঘণ্টা। স্টেশনে লোকজন

নেই, হোটেলগুলোর টিনের ছাত বিষ্টিতে ভিজে চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছে। পাহাড়ের অন্ধকার ছেড়ে হঠাৎ ফাঁকায় পড়ে রিদয়ের ধাঁধা লেগে গেল। আকাশ থেকে সে টিনের ছাতগুলোকে দেখছে যেন ছোট-ছোট পাহাড়ের চুড়ো শাদা বরফে ঢাকা! হাঁসেরা সেই দিকে নেমে চলল দেখে রিদয় চেঁচিয়ে বললে—“কর কি, ওখানে যে খালি বরফ, বসবার জায়গা কোথা!” কিন্তু হাঁসেরা তার কথায় কান না দিয়ে নেমেই চলল!

রিদয় দেখলে পাহাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আকাশে দুই হাত ছড়িয়ে একটা যেন দৈত্য লাল সবুজ দুটো চোখ নিয়ে কটমট করে তার দিকে চেয়ে রয়েছে! রিদয়ের আরো ভয় হল। সে দুই পা গুটিয়ে হাঁসের পিঠের পালকে লুকোবার চেষ্টা করছে এমন সময় হাঁসেরা ঝুপঝাপ করে স্টেশনের টিনের ছাতে নেমে পড়ল। তখন রিদয়ের ভুল ভাঙল, সে দেখলে রাস্তার আলোগুলোকে ভেবেছিল সব তারা, টিনের ছাদগুলোকে পাহাড়ের চুড়ো—আর লাল সবুজ লণ্ঠন দেওয়া সিগনেল পোস্টটাকে একটা দৈত্য।

রিদয় স্টেশন কখনো দেখেনি, টিনের ছাতে ছুটোছুটি করে এদিক-ওদিক দেখতে আরম্ভ করলে, স্টেশনের সব উঁচু চুড়োর দুটো কাঁটা উত্তর দক্ষিণ কোনদিকে বাতাস বইছে দেখবার জন্যে কেবলি ঘুরছে, তারি উপরে একটি গোলা, সেই গোলায় এক-পা রেখে আকাশে চিমটের মতো দুই ঠোঁট উঠিয়ে কঙ্ক-পাখি আরামে ঘুম দিচ্ছেন। রিদয়কে টিনের উপর ছুটোছুটি করতে শুনে কঙ্ক-পাখি গোলার উপর থেকে

ধমকে উঠলেন—“গোল করে কে?”

রিদয়ের দুষ্টুমি গেছে কিন্তু ফষ্টিনষ্টি করবার বাতিক এখনো খুব আছে। সে অমনি বলে উঠল—“গোল আর করবে কে, গোলের মাঝে বসে আছ তুমি, তোমারি এ কাজ!”

“ভালো রে ভালো বলেছিস” বলে কঙ্ক-পাখি চিমটের মতো ঠোঁটে গিরগিটির মতো রিদয়কে ধরে বার কতক আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নিয়ে আদর করে বললে—“দেখ ছোকরা, এত রাত্রে ছাতে খুটখাট করলে এখনি স্টেশন-মিস্ট্রেস মেমের ঘুম ভেঙে যাবে আর স্টেশন-মাস্টার এসে আমাদের উপরে গুলি চালাবে। যদি স্টেশন দেখতে চাও তো ওই জলের পাইপটা ধরে নেমে যাও কিন্তু খবরদার স্টেশনের জল খেও না, তাহলেই ম্যালেরিয়া হয়ে যুধিষ্ঠিরের চার ভাই যেমন একবার মরেছিলেন তেমনি তুমিও মরবে।”

রিদয় বললে—“সে কেমন কথা?”

কঙ্ক বললেন—“শোনো তবে বলি!”

কথার নাম শুনেই চারদিক থেকে হাঁস পাখি যে-যেখানে ঘুমিয়ে ছিল চাঁদের আলোতে টিনের ছাতে বুড়ো কঙ্ক-পাখিকে ঘিরে বসল। চাঁদটাও যেন গল্প শুনতে কঙ্কের ঠিক পিঠের দিকে টিনের ছাদের কার্নিসে এসে বসল।

কঙ্ক গলা খাঁকানি দিয়ে শুরু করলেন:

আমাদের কঙ্ক বংশের শেষ অঙ্কের যে আমি, আমার স্বর্গীয় প্রপিতামহ ছোট-কঙ্ক, তার প্রস্বর্গীয় মধ্যম প্রপিতামহ মেঝো-কঙ্ক মহাশয়ের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ধর্মাবতার বড়-

কঙ্ক—তিনি কাম্য বনে এক রম্য সরোবরে বাস করছেন, এদিকে একদিন হয়েছে কি, না ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের তৃষ্ণা পেয়েছে। বনের মধ্যে তেষ্টা পেয়েছে, খুঁজে-খাঁজে জল খেয়ে নিলেই হত, না হুকুম করলেন—'ওরে ভীম জল নিয়ে আয়।' ভীম চললেন—'জল খুঁজে খুঁজে তাঁরও তেষ্টা পেয়ে গেল। সেই সময় আমাদের ধর্মাবতার বড়-কঙ্ক সে পুকুরে পাহারা দিচ্ছিলেন। সেই কতকালের পানা পুকুরটার দিকে ভীমের নজর পড়ল, জল দেখে ভীমের তেষ্টা যুধিষ্ঠিরের চেয়ে দুগুণ বেড়ে গেল। ভীম তাড়াতাড়ি পুকুরে নামলেন, অঞ্জলি ভরে বৃকোদর প্রায় পুকুরের অর্ধেক জল তুলে নিলেন দেখে আমার স্বর্গীয় প্রপিতামহের পিতামহের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ বলে উঠলেন—'অঞ্জলি করিয়া জল না করিহ পান, সমস্যা পুরণ করি কর জল পান—নতুবা তোমার মৃত্যু।'

সমস্যা দিয়ে জল ফিলটার করে খাবার দেরি সইল না, বৃকোদর আমাদের ধর্মাবতারের পানা-পুকুরের পচাজল চকচক করে খেয়ে ফেললেন। যেমন খাওয়া, অমনি কম্পজ্বর সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু। তার পর অর্জুন এলেন, নকুল সহদেব এলেন, দ্রৌপদী এলেন, সবার সেই দশা, কেউ সমস্যা দিয়ে জল শোধন করে নিতে চাইলেন না। শেষে যুধিষ্ঠির এসে ধর্মাবতার কঙ্কের কথা মতো চারবার সমস্যা দিয়ে জল শোধন করে তবে বেঁচে গেলেন; আর সেই শোধন করা শান্তি জল দিয়ে চার ভাই আর দ্রৌপদীকেও বঁচিয়ে দিলেন।

রিদয় শুধোলে—"বারি শোধন করার সমস্যা কোথায় পাওয়া যায়, তার দাম কত?"

কঙ্ক হেসে বললে—“সমস্যা কি জলের কুঁজো যে, বাজারে পাবে? সমস্‌কৃততে সমস্যা লেখা হয় মন্তরের মতো, সেইটে পাঠ করে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলে এক নাক টিপে নাকের মধ্যে জল টেনে নিতে হয়, আর বলতে হয়, আদি গঙ্গা সাত সমুদ্র তেরো নদী বান্ধিলাম, দশঘড়ায় বান্ধিলাম, জিহ্বার উপর বান্ধিলাম, সরস্বতী যমুনা বন্ধ, মাতা গঙ্গাভাগিরথী ফুঃ ফুঃ ফুঃ। মন্তর যদি শিখতে চাও তো কামরূপ কামিখ্যেয় আমার হাড়গিলেদাদার কাছে যাও। সাপের মন্তর বাঘের মন্তর শেয়ালের মন্তর সব মন্তর তিনি জানেন, আর কোনো ভাবনা থাকবে না নির্ভয়ে যেখানে খুশি বেড়িয়ে বেড়াতে পারবে।”

চকা বলে উঠল—“এ পরামর্শ মন্দ নয়। খেঁকশেয়ালটা যে রকম সঙ্গে লেগেছে তাতে একটা শেয়ালের মন্তর রিদয়কে না শিখিয়ে নিলে তো আর চলছে না। সেই কৈলাস পর্যন্ত যেতে হবে, এর মধ্যে কত বিপদ-আপদ আছে—চল কিছুদিন কামরূপে থেকে গোটাকতক মন্তর নিয়ে যাওয়া যাক।”

কঙ্ক বললেন—“চল, দাদার কাছে আমারো গোটাকতক মন্তর নেবার আছে।” চকাকে কঙ্ক শুধোলেন—“তোমরা কোন পথে কামরূপ যেতে চাও? ব্রহ্মপুত্রের পথে গেলে অনেক ঘুরে যেতে হবে, আর আমার সঙ্গে যদি সিধে রাস্তায় যেতে চাও তো এখান থেকে তরসা নদী একবেলা, সেখান থেকে জলপাইগুড়ি বক্সাও কুচবেহার হয়ে জয়িন্তী আর একবেলা, সেখানে রাত কাটিয়ে মোচু নদীতে জল খেয়ে গোয়ালপাড়া দশটার মধ্যে, সেখানে থেকে বেলা পাঁচটায় মানস নদী, ছটা

নাগাদ কামরূপ কামাখ্যার মন্দির—সেখানে ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে হাড়গিলের চরে আমার দাদা থাকেন।”

চকা কঙ্ক-পাখির কথায় সায় দিয়ে তরসার পথেই বাঁয়ে হিমালয় পাহাড় রেখে সোজা পুবমুখী কামরূপে রওনা হল। খানিক উড়েই চকা বুঝলে কঙ্ক-পাখির সঙ্গে বেরিয়ে ভালো করেনি। তার নাম যেমন কঙ্ক চলাও তেমনি বঙ্ক, মোটেই সোজা নয়। সে সিলিগুড়ি ছেড়েই দক্ষিণমুখো চলল, মহানদীর ধার দিয়ে জলপাইগুড়ি স্টেশন হয়ে তিতলিয়া পর্যন্ত, সেখান থেকে উত্তরপুবে বেঁকে কুচবেহার ঘেঁষে বার্ণিশ-ঘাট, তারপর তিস্তানদীর উপর দিয়ে এঁকতে-বেঁকতে উত্তর মুখে রামসাই হাট হয়ে বোগরা কুঠি, একেবারে পাহাড়তলীতে উপস্থিত, এখান থেকে সেখান থেকে পাহাড়ের বাঁকে-বাঁকে পুবে মাদারী পর্যন্ত। সেখান থেকে তরসা নদীর স্রোত ধরে দক্ষিণে এসে একেবারে কুচবেহারের রাজবাড়ির উপরে এসে পড়া, সেখান থেকে আবার উত্তর আলিপুর বক্সাও জয়িন্তী একেবারে জলপাইগুড়ি পরগনার পুব মোহড়ায় মোচু নদীতে হাজির। এর পরেই গোয়ালপাড়া আরম্ভ।

এইভাবে এদিক-ওদিক একোণ-ওকোণ এপাড়া-ওপাড়া যেন কি খুঁজতে-খুঁজতে কঙ্ক-পাখি তীরবেগে চলেছে। তার সঙ্গে উড়ে চলা হাঁসদের সম্ভব নয়, কাজেই চকা নিজের পথ দেখে হাঁক দিতে-দিতে চলল—“তরসা—তরসা।” ওদিকে যেমন কুঁকড়ো, এদিকে তেমনি উত্তর থেকে দক্ষিণমুখো যে সব নদী চলেছে, তারি ঘাটে-ঘাটে কাদাখোঁচা দলপীপী ঘাটিয়াল হাঁক দিচ্ছে—“তরসা পশ্চিমকুল মাদারি!” মাদারি

হয়ে তরসার উপর দিয়ে হাঁসেরা পাড়ি দিতে লাগল, দূরে ডাইনে কুচবেহারের রাজবাড়ি, তরসার পুবপারে রাজাদের জলকরে পানিকাক হাঁকলে—"বক্স্রাও।" আরও দূরে জলপাইগুড়ির সীমানায় তিতিরে হাঁকলে—"জয়িন্তি।"

জলপাইগুড়ি ছাড়িয়ে গোয়ালপাড়ার মোচু নদীর কাছ বরাবর এসে হাঁসেরা আকাশ মেঘে অন্ধকার দেখলে, জোর বাতাস তাদের ক্রমেই উত্তরে পাহাড়ের গায়ে ঠেলে নিয়ে চলল। হাঁসেরা এঁকে-বেঁকে কখনো উত্তর ঘেঁষে একেবারে হিমালয়ের দেওয়ালের ধার দিয়ে কখনো দক্ষিণে ফাঁকা মাঠের উপর দিয়ে উড়ে চলল, সারাদিন।

গোয়ালপাড়া ছাড়িয়ে কামরূপ মানস নদীর কাছ বরাবর এসেছে, এমন সময় পশ্চিম দিকে বোঁ-বোঁ সোঁ-সোঁ শব্দ উঠল যেন হাজার-হাজার পাখি উড়ে আসছে। পায়ের তলার মানস নদীর জল হঠাৎ কালো ঘোরাল হয়ে উঠল, দমকা হাওয়ার একটা ঝাপটা এসে হাঁসেদের ডানার পালকগুলো উস্কোখুস্কো করে দিলে।

চকা ঝপ করে ডানা বন্ধ করে পলকের মতো চমকে যেন আকাশে স্থির হয়ে দাঁড়াল তারপরে তীরের মতে মানস নদীর দিকে নেমে চলল, ডাক দিতে-দিতে—"সামাল জমি লাও জমি লাও।" কিন্তু জমি নেবার আগেই ঝড় একেবারে ধুলো বালি শুকনো পাতা ছোট-ছোট পাখিদের ঠেলতে-ঠেলতে তরতর করে এসে পড়ল। বাতাসে জোরে মাঝ-দরিয়ার দিকে চকা নিকোবরের দলকে ঠেলে নিতে লাগল, জমি নেবার উপায় নেই। মানস নদীর পশ্চিম কূলে বিজলী-গাঁয়ের উপর দিয়ে

ঠেলতে-ঠেলতে বাতাস হাঁসের দলকে দেখতে-দেখতে মাঝ-দরিয়ায় নিয়ে আসছে, সামনে মানস নদীর ওপারের ভাঙন-জমি পাহাড়ের মতে উঁচু, সেখানে হাওয়া যদি আছড়ে ফেলে, তবে একটি হাঁসও বাঁচবে না। ঘোরবারও উপায় নেই, ওদিকে মাঝনদীতে তুফান উঠেছে, ঝড়ের মুখে উড়ে গিয়ে সামনের ভাঙনে আছড়ে পড়লে মৃত্যু নিশ্চয়, তার চেয়ে জলে পড়ে বরং সাঁতরে বাঁচবার উপায় আছে স্থির করে সব হাঁস ঝুপঝাপ নদীতে নেমে পড়ল, শাদা-শাদা ফেনা নিয়ে চারদিকে সাপের ফনার মতো ঢেউ উঠছে-পড়ছে, একটার পিছে তেড়ে আসছে আর একটা, মাথার উপর ঝড় ডাকছে সোঁ-সোঁ, চারদিকে জল ডাকছে গোঁ-গোঁ, নদীতে একখানি নৌকা নেই, একটি ডিঙ্গিও নেই, কেবল মাঝনদীতে ঢেউয়ের উপরে-উপরে স্রোতের মুখে ভেসে চলেছে মোচার মতো হাঁস কটি।

জলে পড়ে হাঁসেদের কোনো কষ্ট নেই। স্রোতে গা ভাসিয়ে একগাছ ছেঁড়া মালার মতো, ঢেউয়ের সঙ্গে উঠে পড়ে চলেছে। কেবল চকার ভয় হচ্ছে পাছে দলটা ছড়িভঙ্গ হয়ে পড়ে। তাই সে থেকে-থেকে ডাক দিচ্ছে—“কোথায়!” অমনি বাকি হাঁসের উত্তর দিচ্ছে—“হেথায়-হেথায়।” চকা একবার রিদয়কে ডাক দিচ্ছে—“হংপাল-হংপাল।” রিদয় অমনি উত্তর দিচ্ছে—“ভাসান-ভাসান।” আকাশ দিয়ে স্থলচর পাখিরা ঝড়ে লুটোপুটি হয়ে চলেছে। হাঁসের দিব্বি আছে দেখে তারা বলতে-বলতে উড়ে চলল—“সাঁতার-সাঁতার উ-উ-উ গেছি-গেছি-গেছি, মরি-মরি-মরি!” কিন্তু ঢেউয়ের উপর দিয়ে দড়ি ছেঁড়া নৌকার মতো দুলতে-দুলতে চলাতেও বিপদ আছে। চকা দেখলে

হাঁসেরা ডানায় মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়বার যোগাড় করছে, সে অমনি সবাইকে সাবধান করতে লাগল—“ঘুমেসারা দলছাড়া, দলছাড়া, গেছ-মারা, চোক খোল চোখ মেল।” চকা বলছে বটে চোখ খোল কিন্তু নিজেরও তার চোখ ঢুলে এসেছে, অন্য হাঁসগুলো তো একঘুম ঘুমিয়েই নিচ্চে।

ঠিক সেই সময় সামনের একটা ঢেউয়ের মাথায় পোড়া কাঠের মতো একটা কি ভেসে উঠল! চকার অমনি চটকা ভেঙে গেল—সে কুমির-কুমির বলেই দুই ডানার ঝাপট মেরে সোজা আকাশে উড়ে পড়ল, খোঁড়া হাঁস রিদয়কে নিয়ে যেমন জল ছেড়েছে আর কুমির জল থেকে ঝম্প দিয়ে তার খোঁড়াপায়ে একটা দাঁতের আঁচড় বসিয়ে ডুব মারলে। খোঁড়া ইস বলে এক লাফে আর পাঁচ হাত উপরে উড়ে পড়ল। কুমিরটা আর একবার জল থেকে নাটা-চোখ পাকিয়ে নাকটা তুলে এদিক-ওদিক করে ভুস করে ডুব মারলে।

হাঁসের দল উড়তে-উড়তে খানিক গিয়ে আবার জলে পড়ল, কিন্তু সেখানেও আবার কুমির, আবার ওড়া, আবার গিয়ে জলে পড়া—এই ভাবে সারাদিন কাটল।

কত ছোটপাখি যে এই ঝড়ে মারা পড়ল, পথ হারিয়ে একদিকে যেতে আর একদিকে গিয়ে পড়ল, না খেয়ে জলে ভিজে নদীতে পড়ে পাহাড়ে আছাড় খেয়ে কত যে পাখি মরে ঝরে গেল তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

চকার দল হাঁফিয়ে পড়েছে, এদিকে অজানা নদী, ওদিকে অচেনা ডাঙ্গা। পাহাড় থেকে জল বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গড়িয়ে চলেছে—ঝড়ে ভাঙা বড়-বড় গাছের ডাল ভেসে চলেছে,

চকা দলবল নিয়ে একবার গাছের ডালে ভর দিয়ে জিরোবার চেষ্টা করলে কিন্তু ভিজে ডাল একেই পিছল তার উপরে আবার স্রোতে গড়িয়ে-গড়িয়ে চলেছে। বাতাস ক্রমাগত তাদের জলে ঠেলে ফেলতে লাগল, ওদিকে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এল, জলে থাকা আর চলে না, হাঁসেরা উড়ে পড়ল।

আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই, কেবল কালো মেঘ আর বিদ্যুৎ, আর হুহু বাতাস, থেকে-থেকে পাখিরা ভয়ে চীৎকার করে উঠছে, জলের ধারে ঝুপঝাপ পাড় ভেঙে নদীতে পড়ছে, বজ্রাঘাতে বড়-বড় গাছ মড়মড় করে মুচড়ে পড়ছে, এরি মাঝ দিয়ে চকা তার দল নিয়ে ডাঙ্গায় আশ্রয় নিতে চলেছে। হঠাৎ এক সময় সামনে একটা গুনগুন আওয়াজ শোনা গেল, তারপরেই রিদয় দেখল হাওয়ার মতো একটা পাহাড়ের দেওয়াল নদী থেকে আকাশে উঠেছে আর তারি তলায় নদীর জল তুফান তুলে ঝপাঝপ পড়ছে। চকা সোজা পাহাড়ের দিকে চলেছে! রিদয় ভাবলে—এইবার শেষ, আর রক্ষে নেই, সে বিষ্টিতে কুয়াশায় ঝাপসা পাহাড়ের দিকে চেয়ে রয়েছে এমন সময় চকা ডাক দিলে—"বাঁয়ে ঘেঁষে।" দেখতে-দেখতে পাহাড়ের গায়ে প্রকাণ্ড খিলেনের মতো একটা গুহা দেখা গেল, চকা হাঁসের দল নিয়ে তারি মধ্যে সোজা ঢুকে পড়ল—সেখানে বিষ্টি নেই, জল নেই, বাতাসও আস্তে-আস্তে আসছে সোঁ-সোঁ করে। ডাঙ্গায় পা দিয়েই চকা দেখতে লাগল সেথো সবাই আছে কিনা। সবাইকে পাওয়া গেল, কেবল কঙ্ক-পাখি, যে তাদের পথ দেখিয়ে আনছিল তার কোনো খোঁজই হল না!

গুহাটার মধ্যে শুকনো বালি কাঁকর আর ঘাস। হাঁসেরা তারি উপরে বসে ভিজে পালক ঝেড়ে-ঝুড়ে নিচ্ছে, চকা রিদয়কে নিয়ে গুহাটা তদারক করতে চলল। মস্ত গুহা, মুখের কাছটায় আলো পড়েছে, ভিতর দিকটা অন্ধকার, দু-ধারে দেওয়ালের গায় রেলগাড়ির বেঞ্চির মতো থাকে-থাকে পাথর সাজানো—একপাশে একটি ডোবা, তাতে পরিষ্কার বিষ্টির জল ধরা রয়েছে। রিদয় বলে উঠল—"বাঃ ঠিক যেন ধর্মশালাটি।" অমনি গুহার ওধারে অন্ধকার থেকে কারা বলে উঠল—"ধর্মশালাই বটে!" রিদয় ভয়ে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে গেল।

চকা এদিক-ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে অন্ধকারে এ-কোণে ও-কোণে জোড়া-জোড়া সবুজ চোখ পিটপিট করছে। "ওই রে বাঘ!" বলেই চকা রিদয়কে মুখে করে তুলে দৌড়! রিদয় চেঁচাচ্ছে—"বাঘ বাঘ!" সেই সময় অন্ধকরে থেকে জবাব হল—"ভ্যে-ভ্যে ভ্যেড়া!"

এবার রিদয়ের সাহস দেখে কে, সে বুক ফুলিয়ে ভেড়াদের সর্দার দুম্বার কাছে গিয়ে শুধোলে—"এখানে যে তোমরা বড় এলে? এটা আমাদের ঘর, যাও!"

দুম্বা তার কানের দু-পাশে গুগলী পেঁচ দুই শিং পাথরে ঘষে বললে— "এখানে আমরা ইচ্ছে সুখে এসে ধরা পড়ে কামিখ্যের ভেড়া বনে গেছি, যাব কোথায়, যাবার স্থান নেই।"

রিদয় অবাক হয়ে বললে—"কি বল এই কামরূপ কামিখ্যের মন্দির? এইখানে মানুষকে তার ভেড়া ছাগল বানিয়ে রাখে!"

হাঁও বটে নাও বটে, এই ভাবে ঘাড় নেড়ে দুম্বা বললে—"এটা কি গোয়াল না এটা আমাদের বাড়ি—এটা একটা যাদুঘর। এখানে যা দেখছ সব ইন্দ্রজাল, ভৌতিক ব্যাপার। এদিক দিয়ে পাখিরা পর্যন্ত উড়ে চলতে ভয় পায়, তোমরা কার পরামর্শে এখানে এলে শুনি? মহাভারতের ধর্মাবতার কঙ্ক তার কোনো পুরুষের কেউ নয়, সেই বকাধার্মিক কঙ্কপাখির সঙ্গে তোমাদের পথে দেখা হয়নি তো?"

কঙ্ক-পাখির পাল্লায় পড়েই তারা এদিকে এসেছে শুনে দুম্বা হা-হুতাশ করে বললে—"এমন কাজও করে, বকাধার্মিকের কাজই হচ্ছে নানা ছলে লোককে ভুলিয়ে এই কামরূপে এনে মানুষকে ভেড়া, ভেড়াকে ছাগল বানিয়ে দেওয়া, এটা বুঝলে না—কি আপশোষ!"

রিদয় ভয় পেয়ে বলে উঠল—"এখন উপায়!"

দুম্বা খানিক ভেবে বললে—"উপায় আর কি, এক উপায় যদি বকধার্মিক এই ঝড়ে রাস্তা ভুলে অন্যদিকে গিয়ে পড়ে থাকে তবেই তোমরা এবারের মতো বেঁচে গেলে।"

চকা শুধোলে—"আর সে যদি এসে পড়ে তো কি হবে?"

দুম্বা উত্তর করলে—"সে এসে ঠোঁট দিয়ে তোমাদের মাথা ফুটো করে যা কিছু বুদ্ধি আছে মগজের সঙ্গে সবটুকু বার করে নেবে; আর তোমরা কেউ বোকা ছাগল, কেউ মেড়া কেউ ভেড়া হয়ে আ—আ করে তাকেই তোমাদের ভেড়া বানিয়ে দেবার জন্যে বাহবা ধন্যবাদ দিতে থাকবে।"

রিদয় রেগে বলে উঠল—"মাথা ফুটো করতে দিলে তবে

তো? যেমন দেখব সে আসছে, অমনি আমরা সরে পড়ব না?”

দুম্বা শিং নেড়ে বললে—“তা হবার যো নেই, সে ধুলোপড়া দিয়ে সবার চোখে ধুলো দিয়ে কখন যে কাজ উদ্ধার করে যাবে তোমরা টেরও পাবে না। মনে হবে, কে তোমাদের মাথা চুলকে দিচ্ছে, তোমরা ঘুমিয়ে পড়বে আরামে। তারপর চোখ খুলে দেখবে ভেড়া হয়ে গেছ।”

চকা এগিয়ে এসে শুধোলে—“এত বোকা ছাগল বোকা মেড়ায় তার কি দরকার বলতে পার?” দুম্বা খানিক চোখ বুজে বললে—“ঠিক জানিনে, তবে শুনেছি নাকি” —বলেই দুম্বা হঠাৎ চুপ করে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল।

রিদয় ব্যস্ত হয়ে শুধালে—“কি শুনেছ বলেই ফেল না।”

দুম্বা আরো ব্যস্ত হয়ে বললে—“চুপ-চুপ অত চেঁচিও না, কাজ কি বাবু ওসব কথায়, শেষে কি ফেঁসাদে পড়ব? কে কোন দিকে শুনবে, শেষে আমাকে নিয়ে টানাটানি। যাক ও কথা, কুবরী-কুবরী” —বলে দুম্বা চোখ বুজল।

রিদয় অনেক পেড়াপীড়ি করেও কুবরী ছাড়া আর একটি কথাও বোকাছাগলের মুখ দিয়ে বার করতে পারলে না। চকা চুপিচুপি রিদয়কে বললে—“তুমিও যেমন, বোকামেড়া ও, ওর কথার আবার মূল্য আছে? নিশ্চয় ওটার মাথার গোল আছে, এস এখন খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম করা যাক, সকালে উঠে নিজের পথ নিজে দেখা যাবে।” তারপর দুম্বার দিকে চেয়ে বললে—“মশায় যদি জানতেন আমরা আজ সারা

রাস্তাটা কি কষ্টে কাটিয়ে এখানে এসেছি, তবে এই রাতে আমাদের মিছে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার চেষ্টা না করে বরং কিছু অতিথি সৎকারের বন্দোবস্ত করে দিতেন। আমরা নিতান্ত দায়ে পড়েই এখানটায় আশ্রয় নিয়েছি, এখন উচিত হয় আপনার আর কালবিলম্ব না করে আমাদের জন্যে জলযোগ এবং তারপরে সুনিদ্রার ব্যবস্থা করে দেওয়া।"

এবারে দুম্বা অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এসে বললে— "আপনারা আমার কথায় বিশ্বাস করছেন না, আচ্ছা আমি আপনাদের খাবার ব্যবস্থা করছি; দেখুন কি কাণ্ড হয়, তখন কিন্তু আমায় দোষ দিতে পারবেন না।"

চকা এবার সত্যিই ভয় পেলে, কোনদিক থেকে কি বিপদ আসে ভেবে চারিদিক চাইতে লাগল।

দুম্বা ডাকলে—"আসুন আহার প্রস্তুত কিন্তু দেখবেন চটপট আহার সেরে উঠবেন, না হলে ব্যাঘাত হতে পারে। আপনার আসন গ্রহণ করুন আমি এখানে দাড়িয়ে আসন-বন্ধন মন্ত্রটি পাঠ করছি।" রিদয় আর হাঁসের খেতে বসে গেল। দুম্বা মন্ত্র পাঠ করতে লাগল—

মেষ চর্মের আসন তোরে করিরে পেন্‌নাম

আমার এই কার্যে তুই হ রে সাবধান।

কামিখ্যার বরে তোরে করিলাম বন্ধন

এ কার্যে যেন তুই না হোস লঙ্ঘন।।

হাঁসেদের অর্ধেক খাওয়া হয়েছে এমন সময় দূরে ফেউ ডাকল। দুম্বা মন্তর জপতে-জপতে বললে—"ওই শুনছেন

তো এঁরা আসছেন, এরি মধ্যে খবর হয়ে গেছে। ব্যাঘাৎ হল চটপট খেয়ে নিন” বলেই দুম্বা তাড়াতাড়ি মন্তর পড়তে লাগল:

লাগ-লাগ ফেরুপালের দন্তের কপাটি

কোনো ভূতে করিতে নারিবে আমার ক্ষতি

শীঘ্রি লাগ শীঘ্রি লাগ।

মন্তরের চোটে কেউ ঘরে ঢুকতে সাহস পেলে না বটে কিন্তু বাইরে চারদিকে ফেরুপাল চিৎকার করে কানে তালা ধরিয়ে দিতে লাগল—“হুয়া-হুয়া, খাওয়া হুয়া, হুয়া খাওয়া, হুয়া খাওয়া।”

রিদয় বললে—“এত গোল করে কে?” রিদয়ের কথা তখন আর কে শোনে? তখন দুম্বা “ব্যেঘাৎ-ব্যেঘাৎ” বলে চেঁচাচ্ছে আর ঘরের মাঝে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, যেন সর্বনাশ হচ্ছে। রিদয় দুম্বার রকম দেখে চেঁচিয়ে বললে—“আরে মশায়, ব্যাপারটা কি খুলে বলুন না, অত বুক চাপড়ে ছুটোছুটি করচেন কেন?”

দুম্বার তখন ভয়ে মাথা ঘুলিয়ে গেছে সে কাঁপতে-কাঁপিতে বললে—“সর্বনাশ হল, হায়-হায় কি উপায়, কি উপায়!”

রিদয় আরো চটে বললে—“আরে মশায় হয়েছে কি তাই বলুন না?”

দুম্বা তখন একটু স্থির হয়ে বললে—“ওই খেঁকি-খেঁক-খেঁকি খেঁকশেয়ালী ওই তিন ফেরুপাল ওঁরা যদি আমাদের দেওয়া মুড়ো কিম্বা ভেড়ার মাংস না খেতে চান তো কি হবে এখন।”

রিদয় হেসে বললে—“এই জন্যে এতো ভয়, তা ওঁরা যদি আপনাদের মুড়ো মাংস না খান তো আপনাদেরই তো লাভ, এতে আপনার দুঃখুই বা কি, ভয়ই বা কি?”

দুম্বা শিং নেড়ে বললে—“আহা আপনি বুঝেন না, ওঁদের মুড়ো মাংস খাওয়ানো যে ভেড়াবংশের সনাতন প্রথা, সেটা বন্ধ হলে যে আমাদের জাত যাবে, আমরা একঘরে হয়ে যাব, তার করলেন কি?”

রিদয় গম্ভীর হয়ে বললে—“আগে আপনি কি করতে চান শুনি!”

দুম্বা কেঁদে বললে—“আমি এ প্রাণ আর রাখব না—আমি সমাজদ্রোহী, আমি নরকে যাব স্থির করেছি, আমি অতি হতভাগ্য।”

রিদয় দুম্বার শিংএ হাত বুলিয়ে বললে—“ওদের ঠাণ্ডা করবার কি আর কোনো উপায় নেই!”

দুম্বা ঘাড় নেড়ে বললে—“আর এক উপায়—তুষানলে জ্বলে পুড়ে মরা, কিন্তু তার চেয়ে নরককুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়াই সহজ!”

রিদয় বলে উঠল—“কাজ আরো সহজ হয় ওই তিনটে কুকুরকে নরকে পাঠিয়ে দেওয়া!”

দুম্বা দুই চোখ পাকল্ করে অবাক হয়ে বললে—“একি সম্ভব!”

রিদয় বললে—“দেখি তোমার শিং, খুব সম্ভব এক ঢুঁয়ে তিনটেকে একেবারে নরকে চালান করে দেওয়া যায় যদি তুমি তাল ঠুকে লাগ!”

দুম্বা বলল—“তাল ঠুকে ঢুঁ লাগাতে আমি মজবুত কিন্তু ওদের দেখলেই যে আমাদের বুদ্ধি লোপ পায়, তার কি?”

রিদয় দুম্বার পিঠ চাপড়ে বললে—“তোমরা চোখ বুজে থেক—আমি যেমন বলব ‘শিং টিং চট্’ অমনি একসঙ্গে সবাই ঢুঁ বসিয়ে দিও, দেখি ওরা কি করে!”

এবারে অন্য-অন্য ভেড়া তুলাড়ু ঝাঁকাড়ু, তারা এগিয়ে এসে বললে—“আমরা দু-একটা কথা বলতে চাই, আমরা ঢুঁসোতে রাজী কিন্তু তার আগে ভেবে দেখা কর্তব্য যে ফেরুপালদের সরিয়ে দিয়ে কি আমরা চলতে পারব? তারা হলেন আমাদের ধোপা নাপিত এবং চরাবার কর্তা, ধরতে গেলে মেষবংশের মাথা। রাজদ্বারে শ্মশানে চ ওঁরা আমাদের বান্ধব, আত্মীয়, কুটুম্ব বললেই হয়। ওঁরা মাঝে-মাঝে আমাদের চিরুণী দাঁতে টেনে, নখে আঁচড়ে, রোঁয়া ছেঁটে, চাম ছাড়িয়ে, চেটে-পুটে সাফ না করে দিলে—কে মড়মড়ায় কে পড়পড়ায় কে ভাঙে খড়ি? আমাদের গা-শুদ্ধি হবারই যো নেই যদি না পাল-পার্বণে তাঁদের মাঝে-মাঝে মেষ চর্মের আসনে বসিয়ে মেষমাংসে না আমরা মুখশুদ্ধি করিয়ে দিতে পারি, এছাড়া আমরা খাঁড়া আর হাড়িকাট সামনে রেখে হাড়িপ-বাবা আর হাঁড়ি-ঝী মাতাজীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি—তুমি খণ্ডা দ্বিখণ্ডা সুমুক্তি বাহার গরল ভাবহং মানুরিক্ত ঘুমাইয়া আছি স্মটিকের মুণ্ডি! আমাদের এ মাথায় কোনো কাজ করতে গেলেই গুরুর কোপে পড়তে হবে, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পাপে লিপ্ত হয়ে নরকেও যেতে হবে, এর জবাব আপনি কি দেন?”

রিদয়কে আর কোনো জবাব দিতে হল না—খেঁকি-খেঁক-

খেঁকি খেঁকখেকানি তিনটে হেঁড়েল হঠাৎ এসে তিন মেড়ার লেজ ধরে টেনে নিয়ে চলল, হাঁসেরা ডানা ঝটাপট করে গুহার মধ্যে অন্ধকারে উড়ে বেড়াতে লাগল, রিদয় তাড়াতাড়ি দুম্বার পিট চাপড়ে দুই হাতে তার ঘাড় বেঁকিয়ে ধরে হুকুম দিলে—“শিং টিং চট্, দে ঢুঁসিয়ে চটপট।” দুম্বা আর ভাবতে সময় পেলে না, অন্ধকারে সামনে আর ডাইনে-বাঁয়ে তিন ঢুঁ বসিয়ে দিলে। খটাশ-খটাশ করে তিনটে হাঁড়িমুখো হাড়খেগো হেঁড়েলের মাথার খুলি ফেটে চৌচির হয়ে গেল! ঠিক সেই সময় বাইরে দুদ্দাড় করে ঝড়বৃষ্টি নামল—

শিল পড়ে তড়বড় ঝড় বহে ঝড়ঝড়

হড়মড় কড়মড় বাজে—ঘন-ঘন ঘন-ঘন গাজে!

ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝণী বিদ্যুৎ চকচকি

হড়মড়ি মেঘের ভেকের মকমকি

ঝড়ঝড়ি ঝড়ের জল ঝরঝরি

তড়তড়ি শিলার জলের তরতরি

ঘুটঘুট আঁধার বজ্রের কড়মড়ি

সাঁই-সাঁই বাতাস শীতের থরথরী।

ভেড়াগুলো কুরবী-কুরবী বলতে-বলতে এ ওর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে, এমন সময় ঝড়ে একখানা পাথর খসে গুহার মুখটা একেবারে দরাজ হয়ে কত বড় যে হয়ে গেল তার ঠিক নেই! ঝড় থামলে সেই খোলা পথে সকালের আলো এসে গুহার মধ্যে সবাইকে জাগিয়ে

দিলে। চকা সেই আলোতে ডানা মেলে রিদয় আর খোঁড়া আর কাটচাল আর নানকৌড়িকে নিয়ে হাড়গিলের চরে যেখানে আণ্ডামানি লালসেরা হাঁসদের বড় দলটা নিয়ে অপেক্ষা করছে, সেই দিকে চলল।

ভেড়ার দল হঠাৎ কতকালের অন্ধকার গুহার মধ্যে দিনের আলো পেয়ে প্রথমটা অনেকক্ষণ ধরে হতভম্বের মতো আকাশের দিকে চেয়ে রইল, তারপর আস্তে-আস্তে পাহাড়ের উপর বুনো ভেড়ার দলে মিশে দিব্বি চরে বেড়াতে লাগল। রাতের কথা, রিদয়ের কথা, হাঁসদের কথা কোনো কথাই তাদের মনে রইল না। তারা যেন চিরকালই বুনো ভেড়া এইভাবে সহজে খোলা আকাশের নিচে পাহাড়ের চাতালে-চাতালে ঘাস খেয়ে পাতা-লতা খেয়ে মনের সুখে দিন কাটাতে লাগল! ভেড়াদের মধ্যে দুম্বাই কেবল মনে রাখতে পারলে রিদয় কেমন করে, তাদের নরককুণ্ডের মুখের কাছ থেকে পাহাড়ের উপরকার এই খোলা জায়গায় পৌছে দিয়ে গেছে, সেখানে স্বচ্ছন্দে চরে বেড়াতে কোনো বাধা নেই! দলের ভেড়ারা সন্ধ্যেবেলায় অভ্যেস মতো যখন তাদের পুরোনো ঘর গুহাটার দিকে চলল তখন দুম্বা তাদের এক-এক ঢুঁ মেরে বনের দিকে ফিরিয়ে দিলে।

আসামী বুরুঞ্জি



উত্তর থেকে বড়নদী দেখানে ব্রহ্মপুত্রের জলে এসে মিলেছে ঠিক সেই বাঁকের মুখেই কতকালের পুরানো ডিমরুয়ার আসামী রাজা আড়িমাওয়ের নাটবাড়ি। নাটবাড়ির নিচেই নদী মজে গিয়ে মস্ত চর পড়েছে। এত কাল থেকে হাড়গিলে পাখিরা এই চর দখল করে আছে যে, ক্রমে চরটার নামই হয়ে গেছে হাড়গিলার চর। এই চরের ওপারেই দেওয়ানগিরি মস্ত একটা বুড়ো আঙুলের মতো আকাশের দিকে ঠেলে উঠেচে। এই দেওয়ানগিরি হল যত ফরিয়াদি পাখির আড্ডা। একপারে রইল আসামী মাছেদের রাজা আড়িমাওয়ের নাটবাড়ি আর এক পারে দেওয়ানী ফরিয়াদির আড্ডা দেওয়ানগিরি, মাঝখানে

বসে রয়েছেন হাড়গিলে। আসামী ফরিয়াদিতে লড়াই মোকদ্দমা প্রায়ই হয়, তাতে দুই দলই মাঝে-মাঝে মারা পড়ে।

হাড়গিলের খাম্বাজং রাজা দুই দলের মধ্যে আরামে বসে দুই দলেরই হাড়-মাস খেয়ে সুখে আছেন, এমন সময় চর মুখে খবর পৌঁছল বুড়ো-আংলা আসছেন। হাড়গিলের রাজা খাম্বাজং লম্বা-লম্বা পা ফেলে জলের ধারে তাঁর কাশবাগিচায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। 'চুপিম-পা' আর 'চোরম-পা' দুই সেনাপতি পায়ে-পায়ে হাড়গিলে রাজের কাছে হুকুম নিতে এলেন—রিদয়-হংপালকে এপথে আসতে দেওয়া কি না! খাম্বাজং হাড়গিলে অনেকক্ষণ আকাশের দিকে ঠোঁট উঁচিয়ে ভেবে বললেন—"আসতে দিতে পার।" হঠাৎ দেশের মধ্যে মানুষ আসতে দিতে হাড়গিলেচরের প্রজারা রাজী ছিল না। দুই সেনাপতি একটু ইতস্তত করছে দেখে খাম্বাজং সভাপণ্ডিত চুহুংমুংকে ডেকে বললেন—"দেখ তো বুরুঞ্জি পুঁথিতে কলির কত হাজার বছরে এখানে মানুষের আগমন লিখছে?"

চুহুংমুং মুখ গম্ভীর করে বুরুঞ্জির পাতা উল্টে-পাল্টে মাটিতে খানিক আঁক-জোঁক কেটে বললেন—"আগামী ভূতচতুর্দশীতে এখানে সিদ্ধিদাতা গণেশের শাপভ্রষ্ট একজন উপস্থিত হবেন, বারো বৎসর এগারো দিন একদণ্ড তিনপল উনপঞ্চাশ বিপল বয়সে বুরুঞ্জিতে লেখে—সুন্দরবনস্থ আমতলি গ্রামের কাশ্যপ গোত্রের অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ এই মহাপুরুষ, তাঁর আগমনে দেশে সুখসৌভাগ্য সঙ্গে-সঙ্গে মূষিক ও মশক বৃদ্ধি, হেঁড়েল বংশ ধ্বংস ও চুয়াদিগের নাটবাড়ি আক্রমণ এবং হাড়গিলা প্রভৃতির প্রচুর ভোগ ঐশ্বর্য এবং সর্ব-সিদ্ধি যোগ। গণেশ চতুর্থীতে

এই কলির বামন অবতার হংসরথে গৃহত্যাগ করবেন এবং ভূতচতুর্দশীতে উনপঞ্চাশ পবনে ভর দিয়ে কল্পব্দ উনশত উনপঞ্চাশে সূর্যাস্তের দিক হতে উদয় হয়ে ক্রমে সূর্যোদয়ের দিকে অভ্যুত্থান করবেন। শ্যামবর্ণ সুন্দর বপুঃ বুড়োরষ্ট বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভূজ" বলে চুহুংমুং বুরুঞ্জি বন্ধ করলেন।

সেইদিন থেকে হাড়গিলের রাজা খাম্বাজং ভাঙাচোরা পুরানো নাটবাড়ির চুড়োয় গিয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে পশ্চিমমুখো হয়ে ঘাড় তুলে রইলেন—হংপাল কখন আসেন দেখতে, ওদিকে কাকচিরাতে কাকেদের রাজা যোম কাকের কাছে চাঁদপুরী শেয়াল খবর দিয়ে গেল—টিকটিকির মতো এক মানুষ এসে ভেড়াদের বিদ্রোহী করে তুলে হেঁড়েল বংশ ধ্বংস করলে, এবারে কাকেদের আর এঁটো-কাঁটা হাড়-গোড় কিছু পাবার উপায় থাকবে না। মাংসখোর সব মারা গেল, কেইবা আর ভেড়া মারবে, ছাগল ধরবে। কাকচিরাতে কাকের ঘোঁট বসে গেল, কি করলে মানুষটাকে সরানো যায় দেশ থেকে, আর ভেড়া গরু ছাগল এদের আরো বেশি করে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া যায়—যাতে কোনো দিন তারা ফেরুপাল বা সনাতন স্বধর্মের ভুঁড়ো-শেয়ালেদের বিরুদ্ধে শিং চালাতে না পারে।

নদী মাঠ আর জঙ্গল এই তেমাথার মধ্যে রয়েছে কাকচিরার না জঙ্গল, না মাঠ, না পাহাড়, না বালুচর—দূরে থেকে দেখলে বোধ হবে জমিটাতে ঘাসও যেমন গাছও তেমন, পাহাড়ও রয়েছে, নদীও বইছে কিন্তু কাছে গিয়ে দেখ কেবল চোরকাঁটা, শেওড়া আর বড়-বড় নোড়ানুড়ি, কাঁকর, বালি। তার মধ্যে

এখানে-ওখানে কাদাজল নালা নর্দমা!

কোনকালে ফেনচুগঞ্জের এক নীলকর সাহেব এখানে এক মস্ত কুঠি বানিয়েছিল। সেই বাংলা-ঘরখানা এখনো রয়েছে, কিন্তু মানুষ কেউ নেই। কুঠিবাড়ির বাগানে চোরকাঁটার সঙ্গে গোটাকতক দোপাটি ফুলের গাছ, ঘরের সমস্ত সার্সি দরজা বন্ধ, জিনিসপত্র যেখানকার সেখানে গোছানো, অথচ কেউ নেই এখানে। দরজায় চাবি দিয়ে বাড়িওয়ালা যেন দুদিনের মধ্যে আসবে বলে গেল, যেখানে সার্সিটা ভাঙা ছিল সেখানে কাগজ মেরে ঘরগুলি গুছিয়ে রেখে চোরের ভয়ে তালা বন্ধ করে সব ঠিকঠাক রেখে গেল, কিন্তু কোনো দিন এসে আর চাবি খুলে কেউ ঘরে ঢুকল না। বর্ষা এসে সার্সির ফাঁকে আঁটা পুরানো খবরের কাগজটা গলিয়ে দিলে, কাকচিরার একটা কাক কোন সময়ে একদিন ঠোঁটে করে সেই কাগজখানা ঠেলে ফেলে ঘরের ভিতরে যাবার আসবার একটা পথ করে রেখে দিলে। তারপর একদিন বোশেখ মাসে ডিম পাড়বার সময় দলে-দলে কাক এসে কাকচিরায় চিরকাল যেমন বাসা বেঁধে আসছে তেমনি ঘরকন্না পেতে জায়গাটা দখল করে বসল। সকাল না হতে দূর-দূর গ্রামে তারা চরতে যায়, এটোঁ-কাঁটার সন্ধানে। কিন্তু সন্ধ্যার আগেই দলে-দলে এই আপন রাজত্বে তারা ফিরে আসে, রাঙা আকাশ কালো করে।

আমাদের মধ্যে যেমন ডোম চাঁড়াল তেলি মালি যুগি কায়েত বামুন এমনি নানা জাত, কিন্তু দেখতে চেহারায় মানুষ, তেমনি কাকেদের মধ্যেও দেখতে কাক কিন্তু জাত হরেক রকমের রয়েছে—যেমন ডোমকাক বা যোমকাক, ধাড়িকাক বা দাঁড়কাক

বা দাঁড়াকাক, ধোড়াকাক, ঝোড়োকাক, ঢোঁড়াকাক, পাণিকাক বা পাতিকাক, শ্বেতকাক বা ছিটেকাক, ভুষোকাক বা ভুষুণ্ডেকাক! সব কাকেরই চালচলন এক ভাবা ভুল, এদের মধ্যে কোনো দল তারা ভদ্দর সভ্য-ভব্য কাক, ছোলাকলা চিংড়িমাছটা আঁসটা আর বামুনের মতো মরা জানোয়ারের শ্রাদ্ধের ফলার খেয়ে দিন কাটায়, আর একদল কাক তারা যা তা খায় বাচবিচার নেই, পাখির ছানা খরগোস ছানা খেয়েই এরা সুখ পায়। কোনো দলের পেশাই হল লুটতরাজ চুরি চামারি খুনখারাবি। এদের জ্বালায় পাখির বাসায় ডিম থাকবার যো নেই, বাইরে কিছু চকচকে জিনিস রাখবার উপায় নেই। আমসত্ত্ব শুকোতে দিলে এরা খেয়ে যায়, কাপড় শুকোতে দিলেও টেনে ছেঁড়ে, ছেলের হাতের মোয়া কেড়ে খায়, বুড়োর পাকা মাথায় ঠোকর বসায়, চালের খড় টেনে ফেলে, ভাতের থালায় ছোঁ দেয়, এমনি নানা উৎপাত করে বেড়ানোই এদের কাজ।

কাকেদের ডাক নাম শুনলেই বোঝা যায় কোন দল কেমন—যেমন যোমকাকের বংশ তারা হল ডোমকাক, এদের সবাই ভয় করে। মড়া জানোয়ার নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি মারামারিই এদের কাজ। তারপর ধাড়িকাক বা দাঁড়কাক—এরা পুরোনো চালের, কাক যখন কোকিলের মতো গাইতে পারত তখন লোকে এদের পুষে দাঁড়ে বসিয়ে-বলিয়ে ছোলা খাওয়াত। সেই থেকে এরা নানা বিদ্যেতে কৌশলে কারিগরীতে মজবুদ বলে সব কাকই দায়ে পড়লে এদের পরামর্শ মতো চলে। তারপর, ঝোড়োকাক—এরা এককালে সব চেয়ে সাহসী বড়ই নামজাদা রাজবংশ ছিল, এখন বিষ হারিয়ে ঢোঁড়াকাক হয়ে পড়েছে

কাজেই চুপচাপ থাকে সন্ন্যাসীর মতো। পাতিকাক হল পাণিকাকের বংশ, এরা সব দলেই আছে কিন্তু কোনো দলেই এদের পোঁছে না, পুকুর পাড়ে এরা গুগলি শামুক এটোঁ-কাঁটা খেয়েই দিন চালায়। শ্বেতকাক—এরা আসলে দিশি কালো কাকেরই বংশ কিন্তু রঙ বদলে শাদা বিলিতি কাক হতে যাচ্ছে—এদের কারু গলা শাদা, কারু ডানা শাদা, কারু মাথা শাদা, এখনো দোরঙা আছে বলে এদের নাম ছিটেকাক হয়েছে।

পৃথিবীর আদি কাক হল ভুষুণ্ডিকাক, তারি বংশ ভুষুণ্ডে বা ভুষো, দেখতে কালিঝুলি, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই কাকের বংশ চলে আসছে—এদেরই পূর্বপুরুষ রামের সঙ্গে লড়ায়ে একচোখ হারিয়েছিল, সেই থেকে এদের নাম-ডাক ছড়িয়ে পড়েছে, এমন কি এদের নকল করে অনেক কাক একচোখো সেজে নিজেদের বলাতে চাচ্ছে এদেরই একজন, আসলে হয়তো সে পাতিকাক, কিন্তু লেখবার বেলায় লিখছে পাতি অব্ ভুষুণ্ডি! এই সব নানা ধরনের কাকেদের মধ্যে যখন যে দলপতি হয় তখন কাক সমাজকে সে নিজের মতো ভালো-মন্দ নরম-গরম ভাবে চালায়, এই হল কাক সমাজের নিয়ম।

যে কাকটা নীলকর সাহেবের ঘরের সার্সিতে মস্ত ফাঁকটা আবিষ্কার করেছিল, সে বহুকালের পুরোনো রাজবংশী ঢোঁড়াকাক। যতদিন এই ঢোঁড়াকাক দলপতি ছিল ততদিন কাক সমাজ ভদ্ররকম ছিল, কোনো পাখিই তাদের কোনো দোষ কোনো খুঁত ধরতে পারেনি। কিন্তু কাক সমাজে ক্রমে প্রজা বৃদ্ধি হয়ে নানারকম কাক তাতে এসে যখন সেঁধোল তখন চাল-

চোলও ক্রমে বদলাতে আরম্ভ করলে। শেষে একদিন সবাই মিলে ঢোঁড়াকাককে সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে ডোমকাককে সর্দার করে এমন লুটতরাজ মারামারি আরম্ভ করে দিলে যে, পায়রা, সিকরে, গেরোবাজ এমন কি পেঁচারা পর্যন্ত অস্থির হয়ে কাকচিরে ছেড়ে পালাতে পথ পেলে না।

পুরোনো দলপতি ধোড়াকাক সিংহাসন ছেড়ে মনের দুঃখে ঝোড়োকাকের মতো হয়ে ডানা ঝুলিয়ে চুপচাপ শেওড়াগাছের ডালে দিন কাটায়, কেউ তাকে কোনো কথা শুধোয় না, সবাই মিলে বলতে লাগল ওটা বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া হয়েছে, বুড়ো হয়ে বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়েছে। নতুন দলপতি ডোমকাক তামাশা করে তার নাম রাখলে ডরা-কাক, দেশের লোক তাকে বললে ঢোঁড়াকাক! একেবারে কাজের বার ভেবে সবাই তাকে তুচ্ছ করছে দেখে ঢোঁড়াকাক মনে-মনে একটুখানি হেসে আপনার কোণটিতে চুপচাপ রইল। নতুন রাজা ডোম জাঁক দেখাবার জন্যে প্রায়ই ঢোঁড়াকে রাজবাড়িতে নিমন্ত্রণ দিত। কোনো দিন বা নিজের বীরত্ব আর বাহাদুরি দেখাতে শিকারের সময় প্রায়ই সঙ্গে নিত। ঢোঁড়া সব বুঝত কিন্তু বুঝেও বোবা হয়ে থাকত।

ফেনচুগঞ্জের নীলকর সাহেব যদিও অনেক কাল হল কুঠিবাড়ি ছেড়ে গেছে, কিন্তু এখনো কোনো কাকের এমন সাহস হয় না যে সে দিকে যায়, কিন্তু ডরাকাক বলে ডোমকাকের দল যাকে তুচ্ছ করছে সেই কাকটি গিয়ে একদিন কুঠি-বাড়ির মধ্যে যাবার একটি রাস্তা করে এল নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে একলা গিয়ে, কিন্তু খবরটা সে কাউকে জানায়নি! একে

মানুষ তাতে গোরা, তার ঘরে সুড়ঙ্গ কাটা, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসার চেয়েও অসমসাহসের কাজ, কোনো কাক এ পর্যন্ত যা পারেনি ঢোঁড়া সেই কাজটা করেছে—অথচ মুখে তার কথাটি নেই, অন্য কাক হলে চীৎকারের চোটে কাকচিরে মাত করত। নতুন দলপতি ডোমকাকটা দিনের বেলায় এই বুকে পাটকিলে ডোরা টানা ধোড়াকাককে ভয় করে খাতির করে চলত, ধোড়ার বুকের লাল ডোর দেখে তার মনে হত যেন কতকালের মহাযুদ্ধের রক্তের দাগ রাজটিকের মতো এখনো এর বুকে দাগ রয়েছে। কিন্তু রাতে অন্ধকারে যখন লাল-কালো সব এক হয়ে গেছে তখন ডোমকাক ধোড়াকে জ্বালাতন করতে ছাড়ত না—একদিন প্রায় মেরেই ফেলেছিল। সেইদিন থেকে ধোড়া বা ঢোঁড়াকাক শেওড়া গাছে আর ঘুমোতে যেত না, সেই সার্সি দিয়ে চুপিচুপি ঘরের মধ্যে গিয়ে দেওয়ালের গায়ে বেলা আড়াইটা বেজে বন্ধ হওয়া একটা ঘড়ির পিছনে বসে রাত কাটাতে আরম্ভ করলে।

রিদয় যে ঝড়ে পড়ে যোগী-গোফার আশ্রয় নিয়েছিল সেই ঝড়ে কাকচিরার বহুকালের পুরোনো শেওড়া গাছটা গোড়া সুদ্ধ উপড়ে রাজ্যের ডোমকাকের বাসা ডিম ছানা-পোনা নিয়ে উল্টে পড়ল ঠিক বেলা আড়াইটাতে। বাসা গেল, ডিম ভাঙল, তাতে কাগেদের বড় একটা দুঃখ হল না, কিন্তু গাছের গোড়াটা যেখানে উল্টে পড়ে বড় একটা গর্ত দেখা দিয়েছে, সেই গর্তটায় কি আছে না আছে খুঁজে দেখবার জন্যে দলে-দলে কাক আকাশের দিকে পা করা গাছের মোটা-মোটা শিকড়গুলা নিয়ে টানাটানি চেঁচামেচি বাধিয়ে দিলে।

ডোমকাক, ঢোঁড়াকাক পাতিকাক দু'জনকে নিয়ে একেবারে ডোবাটার মধ্যে উড়ে পড়ে এদিক-ওদিক তদারক করে ইট পাটকেল উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল! হঠাৎ এত বড় গর্তটা কেন এখানে আসে, ঠোকর দিয়ে সন্ধান করতে-করতে গর্তের একদিকে খানিক কাঁকর মাটি ঝরঝর করে খসে পড়ল, আর দেখা গেল ইটে-গাঁথা একটা চোর-কুঠুরী, তার মধ্যে তালা দেওয়া ছোট একটা পেটরার সামনে একটা মড়ার মাথা, কতকালের কলঙ্ক-ধরা একটা পিদুম আর গোখরো সাপের একটা খোলস! মড়ার মাথা সাপের খোলস দুটোই সব কাকের দেখা ছিল, পিদুম নিয়েও অনেকবার তারা পালিয়েছে, কিন্তু পেঁটরাটার মধ্যে কি আছে কোনো কাকই তা জানে না, কাজেই এদিকে-ওদিকে ঠোকর দিয়ে তালাটা ধরে নাড়া দিয়ে দেখছে, এমন সময় গর্তের উপর থেকে খেঁকশেয়াল আস্তে-আস্তে বললে—"হচ্ছে কি? ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া কর না, ওতে সাত রাজার ধন আছে, যদি খুলতে চাও তো একজন যক্ ধরে আনো, যকের ধন যক্ না হলে কেউ খুলতে পারবে না।"

সাত রাজার ধন আছে শুনে কাকদের চক্ষু স্থির! চকচকে পয়সা মোহর ভালোবাসতে তাদের মতো দুটি নেই, ডোমকাক পাতিকাক ভূষোকাক ছিটেকাক দাঁড়কাক সব কাক এসে শেয়ালকে ঘিরে—ক্যা-ক্যা-ক্যা কও-কও-কও রব করে গণ্ডগোল বাধিয়ে দিলে। ডোমকাক সবাইকে ধমকে চুপ করিয়ে শেয়ালকে শুধোলে—"যক্ এখন কেমন করে পাওয়া যায়?"

শেয়াল ডাঁওর করে মাথা চুলকে নাক রগড়ে যেন কতই

ভেবে বললে—"আমি জানি এক যকের সন্ধান, সে ছুঁলেই এই বাক্স খুলে যাবে!"

কাকেরা অমনি চীৎকার করে উঠল—"কই-কই" —বলে এগিয়ে গর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডোমকাক তাড়াতাড়ি পেঁটরার উপরে চেপে বললে—"রও-রও"।

তারপর শেয়াল এগিয়ে এসে বললে—"আমি সেই যকের সন্ধান তোমাদের দিতে পারি, যদি তোমরা এই সিন্দুক খুলিয়ে নিয়ে যক্‌টিকে আমার পেট ভরাবার জন্যে দিতে রাজী হও।"

কাকেরা শেয়ালের কথায় রাজী হলে শেয়াল তাদের রিদয়ের খবর জানিয়ে দিলে। তিনকুড়ি কাক সঙ্গে ডোমরাজা ঢোঁড়াকাককে সঙ্গে নিয়ে যক্ ধরতে চলল পাহাড়-জঙ্গলের উপর দিয়ে।

হাড়গিলের রাজা খাম্বাজং যখন চৌষট্টিখানা নাটবাড়ির নহবতখানার চূড়োয় পশ্চিমমুখো হয়ে রিদয়ের আশায় রয়েছেন, আর কাকদের রাজা ডোম রিদয়কে ধরবার জন্যে বনে-জঙ্গলে সন্ধান করে বেড়াচ্ছে, সেই সময় গণেশের নেংটি ইঁদুরদের সঙ্গে পাহাড়ি চুয়োদের যুদ্ধ বেধে গেল। ব্রহ্মপুত্র আর বড়নদীর মোহনার পুরোনো নাটবাড়িটা ইঁদুরদের দখলে কতকাল থেকে আছে তার ঠিকানা নেই। দেওয়ানগিরির উপরে কেল্লার মতো আড়িমাও রাজাদের নাটবাড়ি, প্রকাণ্ড কারখানা, এত বড় নাটবাড়ি যে সেখানে রাজাদের আমলে যে-সব হাতি-ঘোড়া সেপাই-শান্ত্রী থাকত সেগুলোকে দূর থেকে মনে হতো যেন ছোট পুতুল চলে বেড়াচ্ছে। দশ-বারো-হাত চওড়া এক-একখানা পাথরের ইঁটে গাঁথা বাড়ির

দেওয়ালগুলো, এক-একটা থাম যেন এক-একটা তালগাছ! সাততলা বাড়ি কিন্তু তার নিচের পাঁচতলা নিরেট দেওয়ালে ভরাট করা, তার মাঝে পাহাড়ের গহ্বরের মতো অন্ধকার একটা সিংগি দরজা, আশে-পাশে বাক্সর মতো চোরকুঠুরী। সেগুলোতে দেওয়ালই সব, থাকবার জায়গা অল্পই, তাও আবার এখানে-ওখানে লোহার গরাদ দিয়ে বন্ধ, কত কালের অস্ত্র-শস্ত্র, রাজাদের আসবাব-পত্র, চাল-ডাল, ঘি-ময়দা, ধন-দৌলত দিয়ে ঠাসা! যেমন সোঁতা তেমনি অন্ধকার, সে-সব ঘরে একবার ঢুকলে রাস্ত হারিয়ে চিরকাল গোলকধাঁধার মতো ঘুরে বেড়াতে হয়, আর বাইরে আসবার উপায় নেই, এমনি প্যাঁচাও রকমে সে-সব ঘর সাজানো। ছ-তলার উপরে রাজসভা, সেখানে কতকটা আলো-বাতাস আসবার জন্যে সারি-সারি জানলা-বারাণ্ডা, সাততলায় অন্দর মহল, সেখানে জানলা সব খাঁচার মতো পাথরের জাল দিয়ে বন্ধ, পোষা-পাখির মতো রানীদের ধরে রাখার জন্যে ছোট-ছোট কুলুঙ্গি দেওয়া দরজায় শিকল-আঁটা সব শয়ন-মন্দির।

অন্ধকূপ এই নাটবাড়িতে আড়িমাও রাজাদের বংশ ভালো আলো-বাতাস না পেয়ে গুষ্ঠিসুদ্ধ লোকলস্কর সমেত অল্পদিনের মধ্যেই মরে ভূত হয়ে গেল, রইল কেবল বাড়ির চুড়োয় মস্ত একটা পাথরের আলসের উপরে খড়-কুটো দিয়ে বাসা বানিয়ে এক ঠেঙে—সে হাড়গিলের রাজা খাম্বাজং। রানীর শয়ন-ঘরের কুলুঙ্গিগুলোতে গোটাকতক লক্ষ্মী-পেঁচা কালো-পেঁচা ভুতুম-পেঁচা, রাজসভার কার্নিশে-কার্নিশে ঝুলে দলে-দলে বাদুড়, রন্ধনশালায় একটা কালো বেরাল, আর ঘি-ময়দা চাল-ডাল শাল-দোশালা ধন-দৌলতে ঠাসা নিচেকার

ভাঁড়ার ঘরগুলোতে গড়বন্দি পালে-পালে গণেশের নেংটি ইঁদুর। হাড়গিলে পেঁচা বেরাল এরা সবাই ইঁদুরের শত্রু হলেও গণেশের ইঁদুরকে তারা খাতির করে চলত, পৃথিবীর যেখানে যত গণেশ আছে, সবার জন্যে এই নাটবাড়ি থেকে ইঁদুর যায়, এদের কেউ কিছু বলবার যো নেই, কাজেই নেংটি ইঁদুরের দল দেশ জুড়ে নানা উৎপাত আর রাজত্ব করছিল, এই সময় কোথা থেকে তাতারি-চুয়ো এসে হানা দিয়ে, যেখানে-সেখানে গণেশ উল্টে ফেলে নেংটি বংশ ধ্বংস করতে শুরু করে দিলে।

গোলাবাড়ি, ঠাকুর-বাড়ি, গোয়ালঘর, রান্নাঘর, কাচারিঘর, হেঁসেলঘর, শোবারঘর, বসবারঘর, তোষখানা, বৈঠকখানা, দেশের সব জায়গা থেকে তাড়া খেয়ে নেংটি সরে পড়তে লাগল, লড়ায়ে হারতে থাকল, না খেয়ে মরতে লাগল; শেষে এমন হল যে, এক পুরোনো নাটবাড়ি ছাড়া গণেশের ইঁদুর আর কোথাও রইল না। গণেশের সিংহাসন টলমল করতে থাকল, মানুষে নেংটি ইঁদুর মারত বটে কিন্তু গণেশ তাতে টলেননি, কেন না এত ইঁদুর বাইরে-বাইরে জন্মাত যে, মানুষ জন্ম-জন্ম মেরেও তাদের বংশ লোপ করতে পারত না। কিন্তু নেংটিরই বড় জাত যে চুয়ো, তারা যখন এসে হানা দিয়ে পড়ল, তখন গণেশ ভেবে অস্থির হলেন।

এই চুয়োরা একেবারে চোয়াড়, যা-তা খায়, দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি মোটেই নেই, একেবারে গোঁয়ার-গোবিন্দ, দুটি-একটি করে যেন ভালোমানুষের মতো প্রথমে নদী নালার ধারে-ধারে নৌকোর খোলে এসে বাসা বাঁধলে, দেবতার মন্দিরে

কিম্বা মানুষের ভাঙা ঘরের উপরে, গ্রাম-নগরের দিকেই ঘেঁষতো না—নেংটি ইঁদুরগুলো যে সব পোড়ো-বাড়ি, পতিত জমি ছেড়ে গেছে সেই জায়গাগুলোয় এসে রইল, নেংটিদের ফেলে-দেওয়া যা কিছু কুড়িয়ে খেয়ে বড় হতে লাগল। ক্রমে তারা বড় হতে-হতে শেষে নেংটিদের মাটির কেল্লাগুলো দখল করে জমিদারী ফাঁদলে, সেখান থেকে এ জমিদারী সে জমিদারী, এ পরগনা সে পরগনা, এদেশ-সেদেশ, করে সারা দেশ তারা দখল করলে। মাটির নিচেটা দখল করে মাটির উপরে চুয়োর দল লড়াই দিতে যখন বার হল, তখন নেংটিরা বুঝলে দাঁড়াবার স্থান গেছে, নিরুপায় হয়ে তারা যে ক'টা পারে তাদের পুরোনো নাটবাড়ির কেল্লায় এসে ঢুকে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগল। নাটবাড়ির দেওয়াল মোটা, কাজেই নেংটিরা কতকটা নির্ভয়ে রইল, কিন্তু চুয়োরাও ছাড়বার পাত্র নয়; তারা বছরের পর বছর যুদ্ধ চালিয়ে শেষে একদিন নাটবাড়ির উঠোনটা দখল করতে বারোজন তাতারি সওয়ার পাঠিয়ে দিলে! যুদ্ধং দেহি বলে শত্রুদল চারদিক ঘিরে লেজ আপসে লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে, চারদিকে সাজ রে সাজ পড়ে গেছে—

পায় দল কলবল ভূতল টলমল

সাজল দলবল অটল তাতারি।

দামিনি তক-তক জামকী ধক-ধক

ঝকমক চমকত খরতর বারি।

ধূধূ-ধূধূধূ নৌবত বাজে,

ঘন ভোরঙ্গ ভম্‌-ভম্‌, দামামা দদদম্‌
ঝনন্ন ঝম-ঝম ঝাঁজে—
ধা-ধা গুড়-গুড় বাজে।
নিশান ফরফর নিনাদ ধর-ধর
তাতারি গর-গর গাজে।
ধূধূ ধম-ধম ঝাঁ-ঝাঁ ঝম্‌-ঝম্‌
দামামা দম-দম বাজে।
রণজয় ভেরী বাজে রে ঝাঁগড়-ঝাঁগড় ঝাঁ-ঝাঁ ঝাঁজে রে
মুচড়িয়া গোঁফে চলে লাফে-লাফে
খেলে উড়ো পাকে থাকে-থাকে-থাকে ঝাঁপে রে
বাজে রণ ভেরী বাজে রে।
ভয় পেয়ে মরে নেংটি হাজার-হাজার
তল গেল মান মত্তা ইঁদুর রাজার
ঘাসের বোঝায় বসি ইন্দুরানী কাঁদে
ইন্দুরায় এতদিনে পড়িয়াছে ফাঁদে
কান্দি কহে ইন্দুরানী গণেশ গোঁসাই
এমন বিপাকে কভু আর ঠেকি নাই।

এই ভাবে ইঁদুর রানী কাঁদছেন, এদিকে একশো বছরের ইঁদুরের রাজা তাতারিদের ভয়ে থরথরি কম্পমান, রানীর

আঁচল ধরে মন্ত্র পড়ছেন, খট্‌ ভৈরবী—দ্রুত ত্রিতালি—আর কেঁদে বলছেন সুর করে:

চল-চল যাই নীলাচলে। (রে অরে যাই)

ঘটালে বিধি ভাগ্যফলে

মহাপ্রভু জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ

দেখিব অক্ষয় বটতলে,

খাইয়া প্রসাদ ভাত মাথায় মুছিব হাত

নাচি বেড়াই কুতূহলে

ভবসিন্ধু বিন্দু জানি পার হইনু হেন মানি

সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে॥

নেংটির রাজা যখন কেল্লা ছেড়ে রানীকে নিয়ে পাছ-দুয়োর দিয়ে গঙ্গাসাগরের দিকে পলায়নের মতলব করছেন—লড়াই না দিয়ে, সেই সময় হাঁসের দল রিদয়কে নিয়ে দেওয়ানগিরির তলায় এসে উড়ে বসল। একদিকে নাটবাড়ির পাথরের পাঁচিল, আর একদিকে হাড়গিলের চর, এরি মাঝে জলের ধারে শুশনি কলমি শাক খেয়ে হাঁসের দল চরে বেড়াচ্ছে, এমন সময় আণ্ডামানি হাঁসের সঙ্গে দেখা, ছোট দল বড় দল দুই দলে অমনি কথাবার্তা চলল, সাঁতার খেলা আরম্ভ হল।

যোগীগোফাতে ভেড়াদের নিয়ে যে কাণ্ড হয়েছে শুনে আণ্ডামানি বললে—"তা হলে শেয়াল লোভ সহজে ছাড়বে না, নিশ্চয়ই আমাদের পিছু নেবে, আর এখন দুদিন উড়ে কাজ নেই, এইখানেই থাকা যাক, আর ব্রহ্মপুত্রের বাঁক ধরে মানস

সাগরেও গিয়ে কাজ নেই। এইখান থেকে বাঁহাতি মোড় নিয়ে একেবারে পাহাড়ের পাশ দিয়ে সোজা উত্তরে চলাই ভালো।"

চকা বললে—"অজানা রাস্তা কেমন করে যাব।"

আণ্ডামানি অমনি জবাব দিলে—"অজানা নয়, উত্তর সমুদ্রের ধারে রুষ দেশে যে সব পাখিরা থাকে তারা পাহাড়ের এই গলি পথটা দিয়ে সোজা হিমালয়ের ওপারে চলে যায়। আজ ক'দিন ধরে দলে-দলে সারস বক কাদাখোঁচা জলপীপী এরা দেখি এই পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করছে।"

বুড়ো চকা ঘাড় নেড়ে বললে—"ওহে রাস্তা তো আছে জেনেছ, রাস্তার কোথায়, কেমন দানাপানির ব্যবস্থা তার খবর নিয়েছ কি?"

আণ্ডামানি লালসেরা মাথা নেড়ে বললে—"সে খবরও নিতে বাকি রাখিনি। এই দেওয়ানগিরি থেকে বড়নদীর রাস্তা বেয়ে সোজা উত্তরে গেলে তাস্‌গং, তাউয়াং, দুটো বড়-বড় বস্তি, তার পরই চুখাংএর জলা। সেখানে এক রাত্তির কাটিয়ে তার পরদিন সন্ধ্যায় চোনা হ্রদ পাওয়া যাবে, তারপর একদিনে নারায়ুম হ্রদ, সেখান থেকে একবেলার পথ, 'তিগুৎসো'। সেখান থেকে পশ্চিমে গেলে পেমো চাং, বাসাং সো, চোলু, খাম্বাজং গোঁসাইথান হয়ে ধবলাগিরি, আর উত্তর-পুবে গেলে যামদক্ষা নগরের ধারে প্রকাণ্ড পালতি হ্রদ, তার পরে 'তামলং কঙ্কজং' হয়ে আবার ব্রহ্মপুত্রের রাস্তায় পড়া যেতে পারে, অনেক পাখিই এই রাস্তা দিয়ে চলেছে, সেথোর অভাব হবে না। তাছাড়া কঙ্কজাংএর রাজা কঙ্ক-পাখির সঙ্গে যখন তোমাদের পরিচয় আগেই হয়ে গেছে, তখন সেখানেও কিছুদিন জিরিয়ে

যাওয়া যেতে পারে।”

চকা ঘাড় নেড়ে বললে—“সে সব ভালো, কিন্তু ওদিকের আকাশটা যেন কেমন ঘোলাটে ঠেকছে, দেওয়ানগিরির উত্তর গা-টাতে মেঘের ছাওয়াটাও দেখতে পাচ্ছি; হঠাৎ ওদিকে যাওয়া নয়, দু-একদিন দেখা যাক।”

হাঁসদের মধ্যে এই সব পরামর্শ চলেছে এদিকে রিদয় একটা ডোবায় পা ডুবিয়ে আড়িমাও রাজার পুরানো নাটবাড়িটার পাঁচিলের দিকে চেয়ে রয়েছে, এমন সময় দেখলে সন্ধ্যের অন্ধকারে পাঁচিলের ধারে রাশ-রাশ নুড়িগুলো যেন নড়তে-চড়তে আরম্ভ করলে, তারপর সার বেঁধে সব নুড়িগুলো কেল্লার দিকে এগোতে লাগল! রিদয় চেঁচিয়ে উঠল—“দেখ-দেখ!” অমনি সব হাঁস সেদিকে চেয়ে দেখলে দলে-দলে চুয়া রাস্তা ঢেকে চলেছে।

রিদয় যখন বড় ছিল তখন একবার ইঁদুরের কামড় কেমন টের পেয়েছে, এখন এই বুড়ো-আংলা অবস্থায় ইঁদুরের পাল্লায় পড়লে যে কি হবে তাই ভেবে সে কাঠ হয়ে দাড়িয়ে রইল! হাঁসেরাও রিদয়ের মতো ইঁদুরের গন্ধ মোটেই সইতে পারত না, যতক্ষণ সেদিক দিয়ে ইঁদুরগুলো গেল ততক্ষণ সবাই চুপচাপ মুখ বন্ধ করে রইল। তারপর ‘ছি-ছি’ বলে যেন কেবলি ডানা ঝাড় দিতে শুরু করে দিলে।

চুয়োর দল ছোট-বড় নুড়ির ঝরনার মতে গড়াতে-গড়াতে পাথরের পাঁচিলের গোড়া বেয়ে নাটবাড়ির সিংগি দরজার দিকে চলে গেল, ঠিক সেই সময় আকাশে দুই পা লটপট করতে-করতে হাড়গিলে-রাজ খাম্বাজং ঝুপ করে হাঁসদের

মধ্যে এসে পড়লেন। রিদয় এমনতরো পাখি কোনোদিন দেখেনি, এঁর মাথা, গলা আর পিঠ শাদা রাজহাঁসের মতো, ডানা দু'খানা কালো দাঁড়কাকের মতো, তেলে পাকানো গেঁটে-বাঁশের ছড়ির মতো লাল দুখানা সরু ঠ্যাং, আর বারে হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচের মতো এতটুকু মাথায় এত বড় এক লম্বা ঠোঁট—এক আঙুল কলমের যেন দশ আঙুল নিব, তার ভারে মাথাটা ঝুঁকেই আছে, মুখের দুপাশে বোয়াল মাছের মতো দুটো চোখ বসানো! রিদয়ের বোধ হল, পাখি মাছ কাঁকুড় কলম বাঁশ সব মিলিয়ে যেন এই পক্ষীরাজ সৃষ্টি হয়েছে!

হাড়গিলেকে দেখে চকা তাড়াতাড়ি ডানার পালক ঝেড়েঝুড়ে সামনে এগিয়ে এসে দণ্ডবৎ হয়ে দু-তিন বার প্রণাম করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল হঠাৎ খাম্বাজং কি কাজে এলেন! নাটবাড়ির চুড়োয় হাড়গিলের বাসা চকা জানে আর ফাল্গুন মাসের গোড়াতেই হাড়গিলেকে আনবার পূর্বে খাম্বাজং বাসাটা একবার তদারক করতে প্রতি বছরে এখানে এসে থাকেন সেটাও জানা কথা। কিন্তু হাড়গিলেরা তো হাঁসদের সঙ্গে প্রায়ই আলাপ-সালাপ রাখে না, হঠাৎ আজ হাঁসের দলে রাজার আগমন হল কেন, এটা চকা ভেবে না পেয়ে একবার ঘাড় চুলকে বললে—"জং বাহাদুরের বাসার খবর ভালো তো, গেল ঝড় বৃষ্টিতে কোনো লোকসান হয়নি তো?"

হাড়গিলেরা সবাই তোতলা, সহজে কথা কওয়া তাদের মুশকিল, খাম্বাজং অনেকক্ষণ ঠোঁট কাঁপিয়ে এ-চোখ বুজে ও-চোখ খুলে ভাঙা গলায় কাঁদুনি শুরু করলেন—"বুড়োবয়সে

বাসাটা ঝড়ে পড়ে গেছে, একে উঁচু নাটবাড়ি, তায় আবার চুড়ো, গিন্নি দেখে-দেখে সেখানেই বাসা বাঁধলেন, টিকবে কেন! এই বুড়োবয়সে জল-ঝড়ের মধ্যে ঐ গোটা কতক ভাঙা কাঠির বাসায় তো আমার টেকা দায় হয়েছে! এদিকে আবার মানুষগুলো সমস্ত জলা আর খাল-বিল ভরাট করে তার উপর দিয়ে রেলগাড়ি চালাবার বন্দোবস্ত করচে, দু-একটা সাপ ব্যাঙ যে ধরে খাব তারও রাস্তা বন্ধ! শুনেছি না কি আবার এই নাটবাড়িটাতে ইষ্টিশান বসাবে, তাহলে তো আমাকে এদেশ ছাড়তে হয় দেখি!"

চকা খুব দুঃখ জানিয়ে বললে—"আপনি তো তবু এতকাল এই নাটবাড়িতেই কাটালেন, ইচ্ছে করলে পরেও আপনি ইষ্টিশানের চূড়োটায় বাসা বাধতে পারেন। মানুষে কোনোদিন আপনার উপরে গুলিও চালাবে না। আর বাসা থেকে আপনার আণ্ডাবাচ্চা চুরি করে ভেজেও খাবে না, আপনার তো কোনো পরোয়া নেই। বড় জোর এখন চুড়োয় আছেন, না হয় চরে নেমে বসবেন; কিন্তু আমাদের দশা দেখুন দেখি—

ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে

মরণং গোমতী তীরে অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি।

এই ভাবেই সারা জীবন কাটাতে হবে। আপনার তো যাহোক একটা দাঁড়াবার স্থান আছে, আমাদের দশাটা ভাবুন তো। ভবঘুরের মতে—

যেখানে-সেখানে শোও আর খাও

পৃথিবীটা ঘিরে চক্কর দাও

শেষ একদিন অকস্মাৎ!

বিনি মেঘে বজ্রাঘাৎ!

তাগে পেলেই মানুষ গুলি চালাচ্ছে আমাদের দিকে!”

হাড়গিলে গলার পালকের দাড়ি দুলিয়ে বললেন—“কথাটি তো বলেছ ঠিক, কিন্তু নাটবাড়ি হয়ে পর্যন্ত ঐ চুড়োটায় বাস করে আসছি সাতপুরুষ ধরে, আজ হঠাৎ চুড়ো থেকে চরে নেমে বসা কি কম কষ্টের কথা, আর ঐ হাড়গিলের চরটাও শুনেছি মানুষের চেঁচে ফেলে ওখান দিয়ে বড়-বড় মালের জাহাজ চালাবে!”

চকা এবারে আমতা-আমতা করে বললে—“তা হলে তো মুশকিল দেখছি, মানুষের সঙ্গে তো আমরা পেরে উঠব না, এবিষয়ে আপনি—”

এবারে হাড়গিলে ঠোঁট বাজিয়ে বলে উঠলেন—“আঃ, সে মানুষের কথা, যখন তারা আসবে তখন ভাবা যাবে। এখন একটা কথা শুধোই, এদিক দিয়ে চুয়োদের পল্টন যেতে দেখেছ কি?” হাজার-হাজার চুয়ো এইমাত্র এইদিক দিয়ে গেছে শুনে হাড়গিলে আকাশে চোখ তুলে বললে —“এতদিনে বুঝি গণেশের ইঁদুরের দফা রফা, আজ রাতের মধ্যেই চুয়োরা নাটবাড়ি দখল করবে।”

চকা ভয় পেয়ে বললে—“কি বলেন লড়াই বাধবে নাকি?”

হাড়গিলে বলে উঠলেন—“বাধবে আর কি, বিনা যুদ্ধে চুয়োরা আজ কেল্লা মেরে নেবে, রাজা গঙ্গাসাগরের দিকে রানীকে নিয়ে দৌড় দিয়েছেন। বামুন গেল ঘর তো লাঙ্গল

তুলে ধর, কেল্লায় যারা ছিল তারা মানস সরোবরের ধারে আসছে পূর্ণিমায় পক্ষিরদলের বারোয়ারীর নাচ দেখতে ছুটেছে, ঠিক ঝোপ বুঝেই চুয়োর দল কোপ দিতে চলেছে। কেল্লায় গোটাকতক অকর্মণ্য বুড়ো নেংটি ছাড়া আর তো কেউ নেই, এতকাল নেংটিদের সঙ্গে এই নাটবাড়িতে কাটালেম, এখন বুড়ো বয়সে আর শিং ভেঙে বাছুরের দলে যাওয়ার মতো চুয়োর দলে ভিড়তে আমার ইচ্ছে যায় না, তাই ভাবচি থাকি কি যাই।"

হাড়গিলে যে ইঁদুরদের বিপদের খবরটা না দিয়ে হাঁসের দলে এসে কাঁদুনী শুরু করেছে এটা চকার মোটেই ভালো লাগল না। সে একটু এগিয়ে গিয়ে হাড়গিলেকে বললে— "গণেশের ইঁদুরদের আপনি ও-খবরটা পাঠাননি এখনো?"

হাড়গিলে গলার থলি দুলিয়ে বললে—"খবর দিয়ে লাভ? তারা আসবার আগেই সে কেল্লা দখল হয়ে যাবে।"

চকা এবারে চটে বললে—"হয়ে যাবে বললেই হয়ে গেল, এমন অঘটন হতে দেব না আমি বলছি!"

যে চকার ঠোঁট একেবারে ভোঁতা, নেই বললেই হয় আর যার পায়ের নখও ততোধিক ধারাল, সন্ধ্যে না হলেই যার ঘুম আসে, তিনি লড়তে চান চিরুনিদাঁত চুয়োদের সঙ্গে! হাড়গিলে হেসেই অস্থির। ঘাড় নেড়ে চকাকে বললেন— "বুরুঞ্জিতে লেখা আছে এই ঘটবে, কারো সাধ্য নেই তা রদ করা, আমি পণ্ডিতদের দিয়ে গণিয়ে দেখেছি কোনো উপায় নেই, না হলে আমি চুপ করে বসে আছি!"

চকা হাড়গিলের কথায় কান না দিয়ে ডাক দিলে—“পাঁপড়া নান্‌কৌড়ি, নেড়োল কাটচাল, লালসেরা, আণ্ডামানি, চোকধলা ডানকানি, পাটাবুক হাস্‌ন্ত্রি, মারাগুই চাপড়া, তীরশুলি আকাবর, তোমরা যাও মানস সরোবরের পথে যত নেংটি দেখবে সবাইকে খবর দাও লড়াই বাধবে।” অমনি সাতটা বুনো হাঁস অন্ধকারে ডানা ছড়িয়ে উড়ে পড়ল। চকা আবার বাঙলাদেশের হাঁসদের ডাক দিলে—“সন্ধীপের বাঙ্গাল, ধনমাণিকের কাওয়াজী, রায়মংলার ঘেংরাবল, চব্বিশ পরগনার সরাল!” অমনি তেল চুকচুকে মোটাপেট পাঁচজন উপস্থিত হল হেলতে-দুলতে, চকা তাদের বললে—“চট করে যাও গঙ্গাসাগরের দিকে, নেংটিদের রাজা পলাতক ইন্দুরায় আর ইন্দুরানীকে ফিরিয়ে আনে।।” কিন্তু এবারের দল অত চটপট উড়ে পড়ল না, বাঙাল মাথা চুলকে বললে—“এ-কাজটা কি সমীচীন হবে, ইদুরের যুদ্ধে হাঁসেদের যোগ দেওয়া কি সঙ্গত, তা ছাড়া এই অন্ধকার রাত্রে আপনাকে একলা এই শত্রুদের মাঝে—”

চকা ধমকে উঠল: “বড় দেরি করছ তোমরা!” বাঙলার হাঁসরা পটাস-পটাস করে ডানা ঝাপটে দক্ষিণ মুখে আস্তে-আস্তে উড়ে চলল।

চকা তাদের দিকে খানিক কটমট করে চেয়ে থেকে সুবচনীর হাঁসকে বললে—“তুমি গিয়ে হাড়গিলে চরে চুপচাপ বসে থাক, আমি কেবল হংপাল বুড়ো-আংলাকে পিঠে নিয়ে নাটবাড়িতে যাব, যদি কেউ চুয়োদের তাড়াতে পারে তো এই ছোকরা।” বলে চকা হাড়গিলের সঙ্গে রিদয়ের আলাপ করে দিলে।

টিকটিকির মতো বুড়ো-আংলাকে দেখে হাড়গিলে একবার

গলার থলি ফুলিয়ে খানিক হেলে-দুলে হেসে নিলেন। তারপরে ঝপ করে ঠোঁটে করে রিদয়কে আকাশে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে লোফালুফি শুরু করে দিলেন, রিদয় ভয়ে চীৎকার করতে লাগল। চকা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বললে—"জং বাহাদুর করেন কি! ওটা মানুষ—ব্যাঙ নয়, ওকে ছাড়ুন, গেল যে!"

"মানুষ!" বলেই হাড়গিলে মাটিতে রিদয়কে নামিয়ে দিয়ে দু-চারবার ডানা আপসে নৃত্য করে বললেন—"বুরুঞ্জিতে ঠিক তো লিখেছে, অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ এই মহাপুরুষ এসেছেন ঠিক ভূতচতুর্দশীতেই, আর ভয় নেই, আমি এখনি গিয়ে নাটবাড়ির সকলকে এ-খবর দিচ্ছি। জয় গণেশের জয়" —বলে হাড়গিলে নাটবাড়ির দিকে উড়ে গেল।

হাড়গিলের ব্যবহারে রিদয় ভারি চটে ছিল, সে গোঁ হয়ে চকার পিঠে উঠে বসল। নাটবাড়ির চুড়োয় একখানা যাঁতার মতো পাথর, তার মাঝখানটায় রাজাদের ধ্বজি গাড়বার একটা গর্ত, সেই গর্তে খান দুই পুরোনো হোগলা পাতার মাদুর বিছানো, তার উপরে কাটকুটো আর পালকের তোশক, একপাশে কোন কালের রানীদের ছেঁড়া কাপড়ের এক টুকরো জরির আঁচল মাদুর-ছেঁড়ার মধ্যে ঝিকমিক করছে, কতকালের মরচে-ধরা একটা খিল-ভাঙা তালা, একটা কলঙ্ক-পড়া রূপোর চুষিকাঠি, ভোঁতা একটা শরের কলম, ছেঁড়া একপাটি জরির লপেটা জুতো, আধখানা পরকোল। লাগানো শিংএর চশমা একটা, গেল বছরের ফাটা চিনের পেয়ালার মতো গোটাকতক ডিমের খোলা, পেটটা ফুটো-করা একটা আধমরা ব্যাঙ, এমনি সব নানা সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে বাসাটা ভর্তি। কতকালের সে

বাসা তার ঠিক নেই, তার গায়ে ছোট-বড় ঘাস-পাতা গজিয়ে গেছে, এমন কি গোটাবারো লতাওয়ালা একটা বটগাছ পর্যন্ত, তাতে আবার ফল ধরেছে।

চকার সঙ্গে রিদয় এসে দেখলে নাটবাড়ির সবাই এসে আজ বাসায় হাড়গিলেকে ঘিরে কি সব পরামর্শ করছে, এই বুড়ো ভুতুম পেঁচা একদিকে বসে গোল দুই চোখ বার করে কেবলি হুঁ হুঁ সায় দিচ্ছে, কালো বেরালটা লেজ নাড়ছে আর মিউমিউ করে কি যে বকছে তার ঠিক নেই, হাড়গিলে মাঝে বসে কেবলি গলার থলি ঝাড়ছেন আর পাঁচ গণ্ডা বুড়ো নেংটি ইদুর শুকনো মুখে একধারে চুপটি করে বসে এদিক-ওদিক কান ঘোরাচ্ছে।

ইদুর বেরাল পেঁচা হাড়গিলে একখানে জমা হয়েছে দেখেই রিদয় বুঝলে নাটবাড়িতে আজ বিষম গণ্ডগোল। চকা আর রিদয়ের দিকে কেউ আজ চেয়েও দেখলে না, সবাই চেয়ে রয়েছে হাঁ করে যেদিক দিয়ে দলে-দলে চুয়ো সার বেঁধে মাঠের উপর দিয়ে আসছে!

ভুতুম পেঁচা খানিক ভূতের মতো নাকিসুরে চুয়োদের বিষম উৎপাতের কথা বর্ণনা করে চলল। বেরাল মিউমিউ করে খানিক কাঁদুনি গাইলে—“এই বুড়ো বয়সে শেষে কি চুয়োর পেটে যেতে হবে নাকি, আণ্ডাবাচ্ছা কাউকেই তারা রেহাই দেবে না!”

হাড়গিলে ইদুরদের ধমকে বললেন—“এই দুঃসময়ে তোমাদের চাঁইদের বারোয়ারিতে যেতে দিয়ে যত মুখ্যুমি করেছ, লড়াই দেবার জন্যে একটা লোক পর্যন্ত রইল না কেল্লায়! আমি কি

এই বুড়ো বয়সে চুয়ো মেরে ঠোঁটে গন্ধ করতে পারি, ছি-ছি! এমন করে কেল্লা ফাঁক রেখে সব নেংটির চলে যাওয়াটা ভারি অন্যায় হয়েছে!”

ইদুরগুলো কেবল হতভম্ব হয়ে বেরালের দিকে চাইতে লাগল। বেরাল ফোগলা দাঁত খিঁচিয়ে বললে—“আমার দিকে দেখছ কি? তোমরা নিজেদের ঘর সামলাতে না পার নিজেরাই মরবে। আমার কি, আমি ষষ্ঠীর দুয়োরে গিয়ে ধন্না দেব। সেখানে পেসাদের কিছু না পাই দুধ তো আছে।”

ইঁদুরেরা হাড়গিলের দিকে চাইতে তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন—“আমি আর কি করতে পারি বল? এই অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ টিকটিকির মতে মানুষটিকে তোমাদের এনে দিলেম, এর সঙ্গে পরামর্শ করে যা ভালো হয় কর। আমার যথাসাধ্য তো তোমাদের জন্যে করলেম, এখন যা করেন গণেশ ঠাকুর। আঃ, আর পারিনে!” বলে হাড়গিলে পা মোড়া দিয়ে আকাশের দিকে ঠোঁট তুলে চোখ বুজলেন।

ইদুর বেরাল পেঁচা একবার রিদয়ের মুখের দিকে চাইলে তারপর আস্তে-আস্তে সভা ছেড়ে যে যার বাসায় যাবার উদ্যোগ করলে। এদের রকম দেখে চকার এমনি রাগ হচ্ছিল যে সব কটাকে ঠেলে সে চুয়োদের মুখে ফেলে দেয়, বিশেষ ওই একঠেঙ্গে হাড়গিলেটাকে এক ধাক্কায় নাটবাড়ির চুড়ো থেকে একেবারে নিচে ফেলে দেবার জন্যে চকা নিসপিস করতে লাগল।

রিদয় তাকে চোখ টিপে বললে—“চুয়োদের জব্দ করা শক্ত নয়, যদি নাটবাড়ির ঠাকুরঘরের লক্ষ্মী পেঁচা আমাকে এখনি

একবার ঠাকুরঘরে যে দুয়োরের উপরে কুলুঙ্গীতে গণেশ বসে আছেন তাঁর কাছে নিয়ে যান!"

ভুতুম অমনি তাড়াতাড়ি লক্ষ্মী পেঁচাকে ডেকে আনলে। রিদয় লক্ষ্মী পেঁচাকে গণেশের কথা শুধোতে সে বললে— "ঠাকুর তো এখন শয়ন করেছেন, ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ!"

রিদয় চকার সঙ্গে চুপিচুপি দু-একটা কথা বলাবলি করে পেঁচাকে বললে—"পুরোনো দরজা খুলে নিতে কতক্ষণ? চল, পথ দেখাও!"

লক্ষ্মী পেঁচা আগে পথ দেখিয়ে চলল, সঙ্গে রিদয়।

চকা বললে—"এই ভূতচতুর্দশীর রাত্রে পোড়ো বাড়িতে একা তোমার সঙ্গে যেতে দিতে মন সরছে না—যদি পেঁচোয় পায়, আমাকেও সঙ্গে যেতে হল।"

হাড়গিলে অমনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—"না-না, সে হতে পারে না, তুমি গেলে গোল হবে, বুরুঞ্জিতে লিখছে এই ভূতচতুর্দশীতে একা এই অঙ্গুলি প্রমাণ মানুষটি এসে নাটবাড়িতে মূষিকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে হাড়গিলে বংশের সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধি করবেন। তুমি গেলে শাস্ত্রের কথা মিথ্যা হয়ে যায়। এই নাও শনিবার অমাবস্যাতে তোলা এই মানকচুর শিকড় সঙ্গে রাখ, ভূত পালাবে।" বলে রিদয়ের হাতে হাড়গিলে তার বাসার ছেঁড়া মাদুর একটু ভেঙে দিয়ে তার কানে মন্তর দিলেন।

রিদয় ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে কচুর শিকড় গুঁজে চিলের ছাতের গোল সিঁড়ি বেয়ে পেঁচার সঙ্গে নেমে চলল, মনে-

মনে ভূতের মন্তর আওড়াতে-আওড়াতে—হং সং বং লং হাঃ ফুঃ! ভূতচতুর্দশীর রাত্রি এমন অন্ধকার যে, ভূতকে পর্যন্ত দেখা যায় না। রিদয় সেই অন্ধকারে পেঁচার সঙ্গে চিলের ছাতের ঘুরোনো সিঁড়ি দিয়ে ক্রমাগত নেমে চলেছে। দুদিকে পিছল পাথরের দেওয়াল, তার মাঝে-মাঝে এক-একটা ঘুলঘুলি, সেইখান দিয়ে একটু যা আলো আর বাতাস আসতে পায়! রিদয় দেওয়ালের গা ঘেঁষে টিকটিকির মতে পায়ে-পায়ে নামছে, অন্ধকারে পেঁচা যে কোনদিকে চলেছে সেই জানে, কেবল সে এক-একবার হাঁকছে—"উচা-নিচা!" আর সেই ডাক শুনে রিদয় চলেছে, ইস্ক্রুপের প্যাঁচের মতো পাক-দেওয়া সিড়ি পার হয়ে অন্ধকারে!

একটা কিসের গায়ে হাত পড়তেই সেটা ক্যেঁ বলে ঝটপট করে উঠল, এক জায়গায় জল পড়ে ডোবা মতো হয়েছে হঠাৎ ঠাণ্ডা জলে পা রেখেই রিদয় থমকে দাঁড়াল, পেঁচা অমনি বলে উঠল—"বাঁয়ে ঘেঁষে!" কখনো বাঁয়ে কখনো ডাইনে কখনো উঁচায় কখনো নিচায় এইভাবে রিদয় চলেছে! চোখে কিছু দেখছে না, কানে শুনছে খালি যেন এখানে কি একটা ঝটপট করে উঠল, ওখানে মাথার উপর থেকে কি ঠিক-ঠিক করে ডাক দিলে, কখনো শুনলে পাথরের গায়ে কে নখ আঁচড়াচ্ছে, ওদিকে কারা যেন দুদ্দাড় করে পালিয়ে গেল, পায়ের কাছে কি একটা পাশমোড়া দিলে, হঠাৎ গালে যেন কে একটা চিমটি কেটে গেল, কানের কাছে চট করে একটা কে 'টু' দিয়ে পালাল! এর উপরে রিদয় নানা বিভীষিকা দেখছে—হঠাৎ এক জায়গায় গোটাকতক চোখ আলেয়ার মতো জ্বলেই আবার নিভে গেল। যেন ইলিশ মাছের জাল নাকের সামনে

কে একবার ঝেড়ে দিয়েই সরে পড়ল, হঠাৎ একটা গরম হাওয়া মুখে লাগল, তার পরেই বরফের মতো বাতাস এসে কাঁপিয়ে দিলে!

রিদয়ের মনে হচ্ছে এইবার সিঁড়ি শেষ হল কিন্তু খানিক গিয়ে আবার সিঁড়ি, আবার চাতাল, আবার ধাপ, আবার দেওয়াল, এমনি ক্রমাগত ওঠানামা করতে-করতে চলা—এর যেন আর শেষ নেই। আঁধি ধাদি ভূত পেত্নি ব্রহ্মদৈত্য ঝাম ঝামড়ি কন্ধকাটা শাঁকচুন্নি ডাকিনী যোগিনী ভ্যাল ভেলকি, পেটকামড়ি সবই আজ ভূতচতুর্দশীতে জটলা করতে বেরিয়েছে, আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে রিদয়কে দেখে কেউ ঝমঝম করে নাচতে লাগল, কেউ ফিকফিক করে হাসতে লাগল। খুল-খাস খিট-খাট আওয়াজ করে ভূতেরা কেউ খড়ম পায়ে, কেউ হাড় মড়-মড় করে, কেউ বা ঘণ্টা বাজিয়ে, কেউবা চটি চটপট করে তার সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। ভয়ে রিদয়ের হাত-পা অবশ হয়ে এসেছে, ঠিক সেই সময় সরু গলির শেষে মস্ত একটা চাতালের উপরে এসে পেঁচা “ঠাকুরবাড়ি” বলেই অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল!

অনেকক্ষণ ধরে কারুর সাড়াশব্দ নেই, রিদয় অন্ধকারে হাতড়ে দেখলে চারদিকে দেওয়াল, দরজাও নেই, কিছুই নেই! রিদয় ভয়ে কাঠ হয়ে দাড়িয়ে আছে, একটা কে তার পায়ে এসে সুড়সুড়ি দিয়ে তাকে আস্তে-আস্তে দেওয়ালের কাছে টেনে নিয়ে গেল, তারপর কিচ করে যেন চাবি খোলার শব্দ হল! একটা মস্ত দরজা হড়হড় করে গড়িয়ে আপনি যেন খুলে যাচ্ছে, পায়ের নিচে পাথরের মেঝেটা তারি ভারে

কাঁপছে!

ঠিক সেই সময় বিকট শব্দে মাথার উপরে ঘটং-ঘং ঘটং-ঘং করে রাত বারোটার ঘড়ি পড়ল। অমনি দপ-দপ করে চারদিকে আলোয়-আলো এসে দেওয়ালীর পিদুম জালিয়ে দিলে, আর ঘণ্টা নাড়তে-নাড়তে ভয়ঙ্কর এক কাপালিক ব্রহ্মদৈত্য মড়ার মাথার খুলিতে ঘিয়ের সলতে জ্বালিয়ে উপস্থিত—

গলে দোলে ভীষণ রুদ্রাক্ষ মালা

পিঙ্গল নয়নে যেন মহেশের কোপানল জালা!

রিদয় দেখলে ঘরের মধ্যে কালো পাথরের প্রকাণ্ড এক মূর্তি, তাতে কতকালের রক্ত চন্দনের ছিটে, ভৈরবটির জিব লকলক করছে আর গায়ে সোনা-রুপো হীরে-জহরৎ আর মুণ্ডুমালা ঝুলছে! ব্রহ্মদৈত্য আরতি আরম্ভ করলেন:

রম্-ঝম্ রম্ ঝম্ শব্দ উঠে

ভূত প্রেত পিশাচ দাঁড়ায় সবে জোড় করপুটে।

তাধিয়া-তাধিয়া বাজায় তাল

তাতা থেই-থেই বলে বেতাল

ববম-ববম বাজায়ে গাল

ডিমি-ডিমি বাজে ডমরু ভাল

ভবম-ভবম বাজায়ে শিঙ্গা

মৃদঙ্গ বাজায় তাধিঙ্গা ধিঙ্গা

ধেই-ধেই নাচে পিশাচ দানা।

রিদয় হাঁ করে ভূতের কাণ্ড দেখছে এমন সময় পেঁচা কানের কাছে ফিসফিস করে বললে, “এখানে নয়, পাশের কুঠরীতে গণেশ ঠাকুরের সভা।” হোমের ধোঁয়ায় আলোগুলো ক্রমে ঘোলাটে হয়ে এল; সেই সময় রিদয় পেঁচার সঙ্গে আস্তে-আস্তে পাশ কাটিয়ে গণেশ মহালের গলিতে সেঁধোল। দেউড়িতে একটা মোটাপেট হিন্দুস্থানী দরোয়ান সিদ্ধি খেয়ে খালি গায়ে ভোঁ হয়ে ঢোলক পিটছে, অন্ধকারে রিদয় তাকেই গণেশ ভেবে ঢিপ করে একটা পেন্নাম দিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়াল।

দরোয়ানজী ভারি গলায় বললে, “কৌন হোঃ?”

রিদয় কিছুই বুঝলে না, তবু ঘাড় নেড়ে বললে—“আজ্ঞে আমি রিদয়, নেংটি ইঁদুরেরা বড় বিপদে পড়েছে তাই—”

“ক্যা বক্-বক্ লাগায়া” —বলে দরোয়ান আবার ঢোল পিটতে লাগল।

রিদয় ভাবলে গণেশ বকের কথা শুধোচ্ছেন; সে তাড়াতাড়ি বললে— “আজ্ঞে বকের সঙ্গে আমার আলাপ আছে, কিন্তু আজ আমি ইঁদুরদের হয়ে লড়াই করতে চাই, সেইজন্যে আপনার ঐ জয় ঢাকটি আমি চাই।” বলে রিদয় যেমন ঢোলকে হাত দিয়েছে, অমনি গণেশের দরোয়ান ধমকে উঠল— “ধেৎ তেরি!”

রিদয় ভয়ে দশহাত পিছিয়ে পড়ল—সেই সময় পেঁচা এসে তার কানে-কানে বললেন—“করছ কি? উনি গণেশ নন,

ভিতরে চল!" তারপর দরোয়ানের সঙ্গে পেঁচা গিয়ে কি খানিক বকাবকি করলে, তখন দরোয়ান দুয়োর ছেড়ে দিয়ে বললে—"আইয়ে বাবু!"

মহলের মধ্যে গণেশের পরিচয় চৌষষ্টি ভাগ কলাবৌ, কেউ রঙ-তুলি নিয়ে আলপনা দিচ্ছিল, কেউ সেতার বাজিয়ে গান-বাজনা করছিল, কেউ মালা গাঁথছিল, কাঁথা বুনছিল, এমনি চৌষষ্টি খাম্বা ঘরের মধ্যে সবাই এক-এক কাজে, হঠাৎ রিদয়কে দেখে সবাই মাথায় ঘোমটা টেনে জুজুবুড়িটি হয়ে বসল।

পেঁচা সেখান থেকে রিদয়কে নিয়ে আর একটা হাতিশুঁড়ো গজদন্তের খিলেনের মধ্যে দিয়ে গণপতি গণেশের বৈঠকখানায় এনে হাজির করে দিলে। রিদয় দেখলে ঘরের উত্তর গায়ে মস্ত একটা তক্তাপোষে গের্দা হেলান দিয়ে থান ধুতি পরে মেরজাই পরে এক ভদ্রলোক বসে আছেন, তার গজদাঁতও নেই শুঁড়ও নেই, মোটা পেটও নয়, দিব্যি দেবতার মতো চেহারা!

পেঁচা রিদয়ের কানে-কানে বললে—"ইনিই রাজা গণেশ, এঁকে যা দরবার করতে হয় কর।"

রিদয়ের মুখে কথা নেই, ইনিই গণেশ! ভয়ে-ভয়ে সে এগিয়ে বললে—"মশায়ের নাম?"

উত্তর হল—"আমি গণপতি, কি চাই?"

রিদয় খুব নরম হয়ে বললে—"যে ইঁদুরগুলিতে চড়ে মশায় বেড়িয়ে বেড়ান সেগুলির বড় বিপদ উপস্থিত!"

গণেশ ভুরু কুঁচকে বললেন—"ইঁদুর! আমি তো কোনো দিন ইঁদুরে চড়িনে!"

রিদয় বললে—"আজ্ঞে, ভুলে যাচ্ছেন আপনি, হস্তী-বেশ ধরে যখন হাওয়া খেতে বেরোন, সেই সময় যে ইঁদুর আপনার গাড়ি—"

গণেশ হোঃ-হোঃ করে হেসে বললেন—"তুমি পাগল নাকি আমাকে শুদ্ধ গাড়ি টেনে চলতে পারে যে ইঁদুর তাকে তুমি কোথায় দেখলে? ছেলেবেলায় আমি দু-একটা ইঁদুর পুষেছিলেম কিন্তু সবগুলোর বাচ্চা হয়ে আমার ঘরে এমনি উৎপাত লাগালে যে, সব ক'টাকে আমি ইঁদুর-কলে ধরে বিদায় করেছি। তুমি ভুল খবর শুনেছ, ইঁদুরে আমি চড়িনে, হস্তীবেশেও সঙ সেজে আমি হাওয়া খেতে যাইনে, নিশ্চয়ই কেউ তোমায় ঠকিয়েছে!"

রিদয় অবাক হয়ে বললে—"সে কি মশায়, ঘরে-ঘরে ইঁদুরে-চড়া আপনার ছবি, তাছাড়া আমি নিজের চোখে দেখেছি আপনি ঢোল বাজিয়ে ইঁদুর নাচ করছেন আমাকে শাপ পর্যন্ত দিয়ে এলেন, এখন বলছেন উল্টো, আমাকে ছলনা করছেন!"

গণেশ গম্ভীর হয়ে বললেন—"বাপু আমি যাই করি, এটুকু জেনো আমি ছলনাও করিনি শাপও দিইনি! ইঁদুরেও চড়িনি কোনোদিন, ঢোলও পিটিনি। ওই আমার দরোয়ানগুলো মাঝে-মাঝে হোলিতে দেওয়ালিতে ঢোল পিটিয়ে আমার কান ঝালাপাল করে, ওদের গিয়ে শুধোও। যদি আর কোনো গণেশ থাকেন তো বলতে পারিনে।"

রিদয় চোখ মুছে বললে—“মশায় যে আমাকে শাপ দিলেন, এখন শাপান্ত না করে দিলে তো আমি মারা যাই!”

গণপতি চোক পাকিয়ে বললেন—“কোনো সাপের ওঝাকে শুধোওগে বলে দেবে, কে তোমায় শাপ দিয়েছে আর কেমন করে শাপান্ত হবে—যাও, আমাকে বিরক্ত কর না!”

রিদয় মুখ কাঁচুমাঁচু করে বললে—“মশায়, আমি গরীব!”

গণেশ বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরালেন।

রিদয় জানত স্তুতি করলেই দেবতারা খুশি হন তাই সে একেবারে গলায় বস্তর দিয়ে গণেশের রূপ বর্ণনা করে গণেশ বন্দনা শুরু করে দিলে:

খর্বস্থূল কলেবর গজমুখ লম্বোদর

বিঘ্ন নাশ কর বিঘ্নরাজ,

পূজা হোম যোগে যাগে তোমার অর্চনা আগে

তব নামে সিদ্ধ সর্ব কাজ।

শুণ্ডে তুলি খৈ মোয়া দন্তে খাও চিবাইয়া

ইঁদুর বাহন গণপতি,

আপনি আসরে উর রিদয়ের আশা পুর

নিবেদিতু করিয়া প্রণতি।

গণেশ কানে হাত দিয়ে বললেন—“আরে রাম রাম কি বাজে বকছ, তুমি তো ভালো বিপদে ফেললে দেখি, রোসো আমি একবার বাড়ির মধ্যে থেকে আসছি, বিশেষ কাজ

আছে।” বলে গণেশ উঠে গেলেন।

এতক্ষণ গণেশের চৌষট্টি কলাবৌ ঘরে কি হচ্ছে দরজার পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছিলেন, কর্তা উঠে যেতেই গণেশ-দাসীকে দিয়ে রিদয়কে ডেকে তাঁরা শুধোলেন—“হ্যাঁগা তুমি কর্তার কাছে কি নালিশ করছিলে?” রিদয়ের মুখে ইঁদুরের খবর শুনে তাঁরা বলে উঠলেন—“ওমা, এই দরবার করতে এসেছ তা বলতে হয়, ওই আমাদের কুমোর-বৌ কর্তার যে মূর্তিগুলো গড়ে-গড়ে ভটচায্যি মশায়ের হাতে দিয়ে লোকের ঘরেঘরে বিক্রি করতে পাঠায়, সেই গণেশের তুমি বুঝি সন্ধান করছ? ওই দরোয়ানজীকে বল সে তোমাকে সেই গণেশের দোকান দেখিয়ে দেবে।”

রিদয় কলাবৌদের পেন্নাম করে আবার দেউড়িতে এসে দরোয়ানজীর সঙ্গে আর একটা ঘুপসী ঘরে গিয়ে দেখলে, দোকানঘরের এক-এক কুলুঙ্গীতে এক-এক রকম গণেশ—গোবর-গণেশ তিনি কলম হাতে পুঁথি লিখছেন, সিদ্ধিদাতা-গণেশ তিনি এক ধামা দিল্লীর লাড্ডু নিয়ে বসেছেন, মাড়োয়ারি-পটির টঙ্ক-গণেশ বসে-বসে খালি আকাশে আঁকশি দিচ্ছেন, হেড়ম্ব-গণেশ তিনি খুব আড়ম্বর করে ঢোল পিটছেন।

রিদয় ঢিপ করে তাঁকে নমস্কার করে বললে—“গণেশদাদা, চিন্তে পারেন?” হেড়ম্ব রিদয়ের কথার জবাব দিলেন সমস্কৃত দেবভাষায়—“বুং।” রিদয় ভাবলে এ তো মুশকিল, যদি বা কত কষ্টে এসে ধরলেম, এখন কথা না বুঝলে উপায়? সে একবার ইঁদুরের দিকে, একবার ঢোলকের দিকে, একবার নিজের দিকে আঙুল নেড়ে ইশারায় বোঝালে ঢোলকটা চাই।

গণেশ ঢোলকটা রিদয়কে দিয়ে এদিক-ওদিক শুঁড় নেড়ে কি বললেন বোঝা গেল না। রিদয় শুধু শুনলে—"বুং চটাপট্ ত্বং কং করং বাদনং পুনস্তম্ ব্যস্তম্ নাদম্ কুণ্ডমকুলম পৌউন্‌দ্রবর্দ্ধনম্ গণ্ডস্থলম্ আগচ্ছতু।"

রিদয় গণেশের মুখ দেখে বুঝলে তিনি খুব খুশি হয়েছেন। সে অমনি আচার্যি পুরুতকে দুর্গোপুজোয় শ্রাদ্ধে শান্তিতে যেমন করে সব মন্তর আওড়াতে শুনেছিল ঠিক তারি নকলে বললে—"হুঁং ভূত স্বাহা, কুরু-কুরু কুণ্ডলিনী নমোঃ আসিতো দেবল গৃহ্যং কুরু তুভ্যং হং যংছট ফট ব্রহ্মবিদ্যা হবিষে স্বাহা অহঃ চিটপটাং হুং শান্তি ভূশান্তিং ভূ্যতরশান্তি অযুধেঃশান্তি ছহরি ছিহরি ছিহরি হরিবোল হরিবোল হরিবোল সূর্য প্রণাম।" গণেশ খুশি হয়ে দুবার ঘাড় নেড়ে "তথাস্তু" বলে চোখ বুজলেন।

রিদয় আস্তে-আস্তে ঢোলক নিয়ে বেরিয়ে এল। দরোয়ান ঘরের দুয়োরেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে অমনি বখশিশের জন্যে হাত পাতল, রিদয় এদিক-ওদিক দেখে আস্তে-আস্তে মান-কচুর শিকড়টি বার করে বললে—"দরোয়ানজী আর তো সঙ্গে কিছু নেই, এইটে নাও।"

দরোয়ান "হাৎ-তেরি," বলে হাত ঝাড়া দিলে।

শিকড় যেমন মাটিতে পড়া অমনি পেচা রিদয়কে ছোঁ দিয়ে একেবারে ঘুরোনো সিঁড়ি বেয়ে ছাতে এসে উপস্থিত। সঙ্গে-সঙ্গে পেঁচো এসে রিদয়কে পেয়ে বসল—রিদয় অজ্ঞান হয়ে পড়ল আর বহুরূপীর চামড়ার মতো তার গায়ের রঙ লাল, নীল, হলদে, রকম-রকম বদলাতে আরম্ভ করলে। হাড়গিলে

অমনি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে মন্তর পড়ে পেঁচো ঝাড়তে বসে গেলেন:

স্কন্ধাপসার শকুনী

অন্ধ পুতনা শীত পুতনা মুখমণ্ডিকা

নৈগমেষ প্রসীদতু

ক্লীং চর্চ্চ হুং হুং ঝংশা

ওঁলং শ্রীং কপালিকং জং জং

তিষ্ঠতি মূষিকং চং চং চর্ব্বশং হংসঃ

হুং ফট্ স্বাহা।

মন্তরের চোটে রিদয় হাঁ করলে, যেন খেতে এল, অমনি চট করে হাড়গিলে ধুনোপড়া বেড়ি পেঁচোর মুখবন্ধন করে দিলেন:

ধুল-ধুল স্বর্গের ধুল

মর্তের মাটি

লাগ-লাগ পেঁচোর দন্ত-কপাটি

হাঁ করে নাড়িস তুণ্ড খা পেঁচির মুণ্ড

যাঃ ফুঃ

কার আজ্ঞে হাড়িপ বাবার আজ্ঞে

হাঁড় মড়-মড় হাড়গিলের আজ্ঞে

শিগ্‌রি যাঃ শিগ্‌রি যাঃ।

পেঁচো রিদয়কে ছেড়ে পালাতেই রিদয় ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। চকা রিদয়ের কানে-কানে শুধোলে—“গণেশ কি বললেন?”

রিদয় বললে—“তা তো সবটা বুঝলুম না, কেবল আসবার সময় তিনি বললেন—তথাস্তু।”

চকা হেসে বললে—“তবে আর কি, কেল্লা মার দিয়া! আর তোমার ভয় নেই। একদিন সকালে উঠে দেখবে, যে রিদয় সেই রিদয় হয়ে গেছ। চল এখন যুদ্ধং দেহি করা যাক গে।”

এদিকে কেল্লা খালি পেয়ে চুয়োর দল এ-ওর পিঠে চড়ে একটা ঘুলঘুলি দিয়ে কেল্লার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটার পর একটা নেংটি ইঁদুরের গড়-ভাণ্ডার সব দখল করে লুঠের চেষ্টায় দলে-দলে পিলপিল করে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় চৌতলায় পাঁচতলায় উঠে ছতলায় রাজসভায় ঠাকুরবাড়িতে, এমন কি অন্দরমহলে পর্যন্ত ঢোকবার যোগাড়, দু-একটা চুয়ো ছাতেও উঠে হাড়গিলের বাসাটা পর্যন্ত প্রায় এগিয়েছে। এমন সময় উত্তর দক্ষিণ থেকে নেংটি ইঁদুরের দলকে খবর দিয়ে চকার বাকি হাঁসেরা ফিরে এল। ঠিক সেই সময় গণেশের ঢোলকে রিদয় চাটি বসালে—ধিক-ধিক-ধিক ধাঁকুড়-ধাঁকুড়।

ঢোলের শব্দে চুয়োর দল লেজ উঁচু করে শিউরে উঠে যে যেখানে ছিল থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, তারপর তালে-তালে লেজ দোলাতে-দোলাতে দলে-দলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে আরম্ভ করলে। চুয়োতে-চুয়োতে কেল্লার প্রকাণ্ড ছাত ভরে গেল, রিদয় চূড়োয় বসে ঢোল বাজাচ্ছে—

চুয়ো, হাততালি দুয়ো

নেংটি ধিং নিগিরি টিং

ধাতিং তিং নাতিং থিং

চুয়ো, হাততালি দুয়ো।

আর সব চুয়ো লেজে-লেজে জড়াজড়ি করে নৃত্য করছে, পেঁচা পালক ফাঁপিয়ে, বেরাল লেজ ফুলিয়ে, হাড়গিলে গলার থলি দুলিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে তাল দিচ্ছে! সব চুয়ো যখন ছাতে এসে জড়ো হল, তখন রিদয় চকার পিঠে চড়ে ঢোল বাজাতে-বাজাতে আকাশে উড়তে আরম্ভ করলে, চুয়োগুলো নাচতে-নাচতে লাফাতে থাকল। আনন্দে তারা মনে করলে যেন সবার ডানা গজিয়েছে, তারা প্রথমে ছাতের পাঁচিল, তারপর ছাতের আলসে, শেষে একেবারে আকাশে ঝম্প দিয়ে ডিগবাজী খেতে-খেতে মাটিতে এসে পড়ে জোড়া-জোড়া হাঁ করে আকাশের পানে চার পা তুলে চেয়ে রইল।

চুয়োগুলো নাটবাড়ির লীলাখেলা সাঙ্গ করে সরে পড়েছে অনেকক্ষণ। হাড়গিলে, বেরাল, পেঁচা পর্যন্ত ঢোলের আওয়াজে এমনি মশগুল হয়ে গেছে যে পায়ে-পায়ে কখন সবাই একেবারে ছাতের প্রায় কিনারায় এসে পড়েছে টেরই পায়নি, হঠাৎ রাত একটার ঘণ্টা পড়ল অমনি রিদয় ঢোল বন্ধ করলে, সবাই চটকা ভেঙে দেখলে কেল্লা খালি, আকাশে অমাবস্যার চাঁদ দেখা দিয়েছে, চুয়ো আর একটাও নেই। রিদয়কে নিয়ে চকা উড়ে চলেছে। হাড়গিলে, পেঁচা চটকা ভেঙেই দেখলে বেরাল আলসে থেকে আকাশে একটা পা বাড়িয়ে চুয়োদের মতো

ঝাঁপ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে আর কি! হাড়গিলে তার লেজ ধরে এক টান দিয়ে বললে—"কর কি, পড়ে মরবে যে!"

বেরাল ফ্যেল-ফ্যেল করে খানিক চেয়ে থেকে—"ইকি" —বলেই ফ্যেঁচ করে হেঁচে আস্তে-আস্তে পেছিয়ে এল।

ওদিকে নেংটির দল আস্তে-আস্তে কেল্লায় এসে যে যার ঘরে ঢুকে ধান ভানতে বসে গেল। চুয়ো তাড়াবার জন্যে হেড়ম্ব-গণেশের ঢোলককে ছাড়া আর কাউকে যে ধন্যবাদ দেওয়া দরকার সেটা তাদের মনেই এল না!

রাতের মধ্যে পেঁচার দল প্রায় বারোআনা মরা চুয়ো খেয়ে সাফ করে দিলে, বাকি যা রইল সেগুলোর উপরে সকালবেলায় কাক চিল এসে পড়ল। বেলা আটটার মধ্যে সব সাঙ্গ হয়ে গেল।

আজ অমাবস্যা তিথি, রাত্তিরটা হিমালয়ের এপারটায় কাটিয়ে কাল থেকে হাঁসেরা পাহাড়ের ওপারে নিজের-নিজের দেশের দিকে রওনা হবে, দেশের কথা ছাড়া আজ আর কারু মুখে অন্য কথা নেই। আকাশে মেঘ করেছে, বিষ্টি নেই, কেবল ঠাণ্ডা হাওয়া আর শীতালু বাতাস। মাথার উপর দিয়ে দলে-দলে পাখি হুহু করে উত্তরমুখে চলেছে—সবাই দেশে যেতে ব্যস্ত, তার ওপর এ-বছর পাখিদের বারোয়ারি পড়েছে। কুঁচেবক কুঁচিবক তারা বারোয়ারির নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছে, যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে চেঁচিয়ে জানাচ্ছে পুর্ণিমার দিনে বারোয়ারিতে যেতে হবে, ভারি জলসা।

চকা নিমন্ত্রণ পেয়ে ভারি খুশি, রিদয়কে বললে—"তোমাদের

দুজনের কপাল ভালো, বারো বছর অন্তর কৈলাস-পর্বতের ধারে মানস-সরোবরে এই বারোয়ারির মজলিস হয়, সেখানে সারসের নাচ, হরিণ-দৌড়, আর্গিনপাখির কনসার্ট, গাঙ-শালিকের গীত, ছুঁচোর কেত্তন, শেয়ালের যুক্তি, মেড়ার লড়াই, ভালুক-নাচ, সাপ-বাজি, মাছের চান, এমনি আরো কত কি হবে তার ঠিকানা নেই! ব্রহ্মার হাঁস কর্মকর্তা, স্বয়ং পশুপতি হবেন সভাপতি, পৃথিবীর পশুপক্ষী সেখানে হাজির হবে। মানুষের কপালে এমন আশ্চর্য কারখানা দেখা এ-পর্যন্ত ঘটেনি, কোথায় লাগে তোমাদের হরিদ্বারের কুম্ভমেলা! আর পাহাড়ের ওধারে আমাদের দেশটা কি চমৎকার তোমায় কি বলব, পালতি জলা—যেটা ব্রহ্মার হাঁস আর পৃথিবীর জলচর পাখি, কি পোষা কি বুনো সবাইকার আড্ডা, সেটা যে কত বড় তা কেউ জানে না, উত্তরের সমস্ত নদী সমস্ত পাহাড় এসে সেইখানেই শেষ হয়ে আবার সব নতুন-নতুন নাম নিয়ে দক্ষিণ দিকে নেমে এসেছে। এই পালতির উত্তর গায়ে ঢোলা পর্বত, সেই ঢোল পর্বতের ওপারে পাঁচিলে ঘেরা চীন মুল্লুক, তারো ওধারে বরফের দেশের ধারে ‘তন্দ্রা’ বলে একটা দেশ। বছরে প্রায় দশ মাস সেখানে বরফের চাদর মুড়ি দিয়ে ফুল পাতা নদ নদী সবই ঘুমিয়ে থাকে, কেবল বসন্তের মাস দুই সেখানে সূর্য দেখা দেন, আর অমনি সারা দেশ ফুলে-ফলে পাতায়-ঘাসে দেখতে-দেখতে সবুজ হয়ে ওঠে, আর আমরা সব পাখিরা মিলে সেখানে গিয়ে বাসা বেঁধে ডিমে তা দিয়ে বাচ্ছা ফুটিয়ে চলে আসি। বসন্তের শেষে পালতি জলায় বাচ্ছারা বড় হবার জন্যে আপনারাই উড়ে আসে, আমরা সারা বছর দেশে-বিদেশে ঘুরে আবার বছরের এই

সময়টিতে গিয়ে দেখি আমাদের ছেলে-পিলেরা কেউ বড় হয়েছে, কেউ বড় হয়ে নিজের পথ দেখে নিতে বিদেশে চলেছে, কোনো-কোনো বাচ্ছা বা মরে গেছে, কেউ-কেউ বা এরি মধ্যে বিয়ে-থাওয়া করে ঘরকন্না পাতবার চেষ্টায় আছে, কোনো বাচ্ছা বা সন্ন্যাসী হয়ে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে গেছে, কাউকে ধরে মানুষে খেয়ে ফেলেছে, কাউকে মানুষে গুলি করে মেরে ফেলেছে আর কাউকে বা তারা জেলখানার মতো খাঁচায় ভরেছে, আর কাউকে বা ডানা কেটে পোষ মানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। বছরের এই সময়টিতে আমরা একবার করে নিজেদের জন্মস্থানে আর পুরোনো বাসায় ফিরে আসতে পাই, নিজের ছেলেমেয়ের দেখা পাই, সুখ-দুঃখের দুটো কথা কয়ে নিই, তারপর আবার চলি এদেশ-সেদেশ করে।"

রিদয় বলে উঠল—"আমারো তো দেশ আছে কিন্তু আমার তো সেখানে ফিরতে একটুও ইচ্ছে হয় না।"

চকা বললে—"সে কি! তোমার বাপ-মা কেউ নেই নাকি? যখন বড় হবে, বৌ হবে সংসার হবে, ছেলে-পুলে নাতি-পুতি হবে তখন বুঝবে সারা বছরের পরে দেশে ফিরতে কি আনন্দ। তখন দেশের ডাক যখন এসে পৌঁছবে তখন দেখবে মন অমনি উধাও হয়ে ছুটেছে আর কিছুতে মন বসছে না, প্রাণ নীল আকাশে প্রজাপতির মতো সোনার পাখনা মেলে দিয়ে উড়ে পড়তে চাচ্ছে, তখন দেশের কথাই কইতে থাকবে। এর সঙ্গে তার সঙ্গে, দিন নেই রাত নেই কি সকাল কি সন্ধ্যে কেবল বঁধুর মুখ মধুর হাসিই মনে জাগবে তখন।"

চকার কথা শুনতে-শুনতে রিদয় কেমন আনমনা হয়ে

গেল। সারাদিন ধরে আজ তার কেবলি মনে পড়তে লাগল—আমতলির সেই ঘর ক'খানি, সেই তেঁতুলতলার ঘাট, তেপান্তর মাঠ, হাঁস-পুকুরের কাদা জল, তাতে শালুক ফুল, বাড়ির ধারে ঝুমকো-লতার মাচা তার উপরে দুগ্‌গা টুনটুনি পাখিটি, উঠোনের কোণে তুলসীমঞ্চটি, কালো মাটি-লেপা ঘরের দেওয়াল তার উপরে মায়ের হাতে লেখা লক্ষ্মীপুজোর আলপনা, দড়ির আলনায় বাপের কোঁচানো চাদর, পুরোনো শোবার তক্তা তার উপরে শীতলপাটি আর লাল ঝালর দেওয়া তালপাতার পাখাখানি। সব আজ পরিষ্কার যেন রিদয় চোখে দেখতে লাগল, আর থেকে-থেকে মন তার ঘরে যেতে আকুলি-বিকুলি করতে থাকল—সকাল কেটে দুপুর হয়েছে, তখনো রিদয় আকাশের দিকে চেয়ে ঘরের কথা ভাবছে—দলে-দলে কত পাখির ঝাঁক দেশমুখে চলে গেল—“চল-চল চলরে চল” বলতে-বলতে। নাটবাড়ির জলায় যত পাখি—

কাদাখোঁচা জলপিপি কামি কোড়া কঙ্ক
পালতির কুঁচেবক আর মৎস্য বঙ্ক।
ডাহুকা ডাহুকি আর খঞ্জনী খঞ্জন
সারস সারসী যত বক বকীগণ।
তিত্তির তিত্তরা পানিকাক পানিকাকি
কুরবী কুরল চক্রবাক চক্রবাকি।

সবাই দলে দলে দেশমুখে উড়ে পড়ছে! রিদয় দেখলে মাথার উপর দিয়ে কত পাখির ঝাঁক দেশ-বিদেশ থেকে, কেউ বন ছেড়ে, কেউ খাঁচা ভেঙে হুহু করে দেশে চলেছে—

ময়না শালিকা টিয়া তোতা কাকাতুয়া
চাতক চকোর নুরী তুরী রাঙ্গচুয়া।
ময়ূর ময়ূরী সারিশুক আদি খগ
কোকিল কোকিলা আদি মরাল বিহগ।
সীকরী বহরী বাসা বাজ তুরমুতী
কাহা-কুহি লগড় ঝগড় জোড়া ধুতি।
শকুনী গৃধিনী হাড়গিলা মেটেচিল
শঙ্খচিল নীলকণ্ঠ শ্বেত রক্ত নীল।
ঠেটি ভেটি ভাটা হরিতাল গুড়-গুড়—
বাকচা হারিত পারাবৎ পাকরাল
হাতারিয়া করকটে ফিঙ্গা দহিয়াল।

চড়ুই মুনিয়া পাবদুয়া টুনটুনি বুলবুল ফুলঝুটি ভিংরাজ রঙে-রঙে সবুজে-লালে সোনালীতে-রূপোলীতে আকাশ রাঙিয়ে চলেছে যে যার দেশে বাতাসে ডানা ছড়িয়ে। রিদয় কেবলি বসে-বসে দেখতে লাগল আর মনে-মনে বলতে লাগল—“যদি ডানা পেতুম!”

পাখিদের দেখাদেখি ভীমরুল ডাঁশ মশা দলে-দলে উড়তে আরম্ভ করেছে, চকার দলের হাঁসেরা আর স্থির থাকতে পারছে না, এখনো সারারাত এখানে কাটাতে হবে ভেবে তারা কেবলি উসু-খুসু করছে আর ডানা ঝাড়া দিচ্ছে!

চকা একবার রিদয়ের কানের কাছে বলে গেল, যা কিছু

নেবার আছে সঙ্গে, এইবেলা বেঁধে-ছেদে রাখ, কাল ভোরেই রওনা হতে হবে। রিদয়ের দেশের জন্যে মনটা আনচান করছে কিন্তু বেড়াবার শখ এখনো মেটেনি। সে পথের মাঝে নিজের আর খোঁড়ার জন্যে গোটাকতক গুগলী টোপাপানা এটা-ওটা সেটা নিয়ে উলুখড়ের একটি গেঁজে বুনতে বসে গেল।

থলেটা তৈরি হতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এল। হাঁসেরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে চোখ বুজে রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে দেবার যোগাড় করছে এমন সময় চকা এসে রিদয়কে শুধালো—"খোঁড়াকে দেখেছ কি? তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

রিদয় তাড়াতাড়ি থলে ফেলে উঠে দাড়িয়ে বললে—"সে কি, গেল কোথায়, শেয়ালে নিলে না তো?"

চকা শুকনো মুখে বললে—"এই তো এখানে একটু আগেই ছিল, হঠাৎ গেল কোথা!"

রিদয় বিষম ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি খোঁজাখুজি করতে লাগল। একে সন্ধ্যা হয়ে গেল, যেখানে পাখির ডাক শোনে সেইদিকেই রিদয় ছুটে যায়, ঝোপ-ঝাড় নেড়ে দেখে, নাম ধরে ডাক দেয়, এমনি সারারাত রিদয় ছুটোছুটি করতে লাগল অন্ধকারে জল কাদা ভেঙে! নাটবাড়ির উঠোনটা পর্যন্ত রিদয় খুঁজে এল, কিন্তু সুবচনীর খোঁড়া হাঁস কোথাও নেই!

এদিকে সকাল হয়ে এল, চকা বললে—"সে নিশ্চয়ই অন্য দলে মিশে এগিয়ে গেছে, আর মিছে খোঁজা, চল আমরা বেরিয়ে পড়ি, সময় উৎরে যাচ্ছে!"

রিদয় ঘাড় নেড়ে বললে—"তাকে না নিয়ে আমি এখান থেকে নড়ছিনে, তোমরা যেতে চাও যাও।"

চকা মুশকিলে পড়ল! রিদয় নড়তে চায় না, এদিকে সব হাঁসেরই দেশে যাবার টান রয়েছে, তবু খোঁড়ার জন্যে চকা আরো এক ঘণ্টা দেরি করলে, তাতেও যখন খোঁড়ার সন্ধান পাওয়া গেল না তখন তারা রিদয়কে একলা রেখে চট করে দেশ থেকে ঘুরে আসবার জন্যে উত্তরমুখে উড়ে পড়ল—আসি-আসি বলতে-বলতে।

চকার দল চলে যেতে রিদয়ের চারদিক যেন শূন্য বোধ হতে লাগল! সে আস্তে-আস্তে নাটবাড়ির ভাঙা পাঁচিলটা আর একবার সন্ধান করতে চলেছে, এমন সময় দূর থেকে দেখলে খোঁড়া কিরাশ-কলমীর ডাঁটা মুখে নিয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে পাঁচিলের গায়ে একরাশ ভাঙাচোরা পাথরের মধ্যে গিয়ে সেঁধোলে। এমনি খোঁড়াকে শেওলাগুলি নিয়ে সেখানটায় আনাগোনা করতে দেখে রিদয় লুকিয়ে-লুকিয়ে পাঁচিলে উঠে দেখলে—জড়োকরা পাথরের মধ্যে চমৎকার ছাই রঙের একটি বালিহাঁস শুয়ে আছে, খোঁড়া তার মুখে খাবার তুলে-তুলে দিচ্ছে আর দুজনে কথা হচ্ছে—"আজ কেমন আছ? তেমনিই? ডানার বেথাটা যায়নি?"

"না, এখনো নাড়তে গেলে বুকটায় বেদনা করে।"

"মানুষগুলো কি নিষ্ঠুর! ভাগ্যি গুলিটা বুকে লাগেনি।"

"লাগলে আর কি হত, না হয় মরে যেতুম!"

"ছি-ছি অমন কথা বল না, আমার ভারি দুঃখ হয়।"

“আমি তোমার কে যে আমার জন্যে দুঃখু হবে; আজ এই দেখা শোনা এত ভাব এত যত্ন, কাল হয়তো তুমি চলে যাবে, দুদিন পরে মনেও থাকবে না, কে বালি কোথাকার বালি!”

খোঁড়া ঘাড় নেড়ে বললে—“অমন কথা বল না, যতদিন বাঁচব তোমায় ভুলব না, জলার মধ্যে এই দিনটি মনে থাকবে!”

বালিহাঁস একটু ঘাড় হেলিয়ে খোঁড়ার গা ঘেঁষে বললে—“আমি দল ছাড়া হয়ে পড়লুম, কতদিনে সারবো তার ঠিক নেই।”

খোঁড়া বুক ফুলিয়ে বললে—“ভয় কি আমি তোমার কাছে রইলুম, এখন একটু ঘুমোও আমি একবার ঘুরে আসি।”

খোঁড়া চলে গেলে রিদয় আস্তে-আস্তে গর্তর মধ্যে ঢুকে দেখলে এমন সুন্দরী হাঁস সে কোনোদিন দেখেনি, এতটুকু তার মুখটি, পালকগুলি নরম যেন তুলো, সাটিনের মতো, ঝকঝক করছে, চোখদুটিও কাজলটানা যেন ঢলঢল করছে! রিদয়কে হঠাৎ দেখে বালিহাঁস ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু বেচারার ডানায় বেদনা, উড়তে পারে না, বালি চআঁ করে কাঁদতে লাগল।

রিদয় তাড়াতাড়ি বললে—“আমি হংপাল হাঁসেদের বন্ধু, খোঁড়া হাঁসের সেঙাত, আমায় দেখে ভয় কি?”

বালিহাঁস রিদয়ের কথায় সাহস পেয়ে ঘাড়টি একটু নিচু করে বললে—“তাঁর মুখে আপনার নাম শুনেছি, আপনি অতি মহাশয় লোক।” এমনি ভাবে এই কথাগুলি বালি বললে যে, রিদয়ের মনে হল কোনো রাজকন্যে যেন তার সঙ্গে আলাপ

করছেন!

রিদয় বললে—“দেখি, আপনার কোথায় হাড়টা ভেঙেছে সোজা করে দিই।” আস্তে-আস্তে বালিহাঁসের ডানার তলায় হাত দিয়ে রিদয় মচকানো হাড়টা ধরে খুট করে যেমন সরিয়ে দেওয়া, অমনি বালিহাঁসটি “মাগো!” বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

রিদয় কখনো ডাক্তারি করেনি, পাখিটি মরে গেল ভেবে সে তাড়াতাড়ি পাছে খোঁড়া এসে দেখে সেই ভয়ে লম্ফ দিয়ে চোচা চম্পট। খোঁড়া বেশি দূর যায়নি, দু-ঢোক জল খেয়েই ফিরে আসছে, পথের মধ্যে রিদয়ের সঙ্গে দেখা! রিদয় তাড়াতাড়ি খোঁড়াকে বললে—“কোথায় ছিলে সবাই যে চলে গেল, সারারাত তোমাকে খোঁজাখুঁজি করেছি, চল আর দেরি নয়, এই বেলা গিয়ে তাদের ধরি, বেশি দূরে এখনো যায়নি!”

খোঁড়া আমতা-আমতা করে বললে—“রোসো, এখনি যেতে হবে? এত শিগ্‌রি কি না গেলেই নয়?”

রিদয়ের ভয় হল পাছে খোঁড়া গিয়ে দেখে বালিহাঁস মরে গেছে। সে তাড়াতাড়ি খোঁড়ার পিঠে চেপে তাকে ওড়াবার চেষ্টা করতে লাগল!

খোঁড়া ঘাড় নেড়ে বললে—“দেখ ভাই আমার এক বন্ধু বড় বিপদে পড়েছে, তাকে একলা ছেড়ে যাওয়া তো হতে পারে না, বেচারার ডানাটি জখম হয়েছে নড়তে পারে না, আমি গেলে তাকে কেবা খাওয়ায় আর কেই বা যত্ন করে!”

রিদয়ের ইচ্ছে হাঁস সেদিকে না যায়, সে কেবলি তাকে

ফেরাতে চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু খোঁড়ার মন পড়ে আছে সেই রূপকথার রাজকন্যের মতো সুন্দরী বালিহাঁসের দিকে, সে রিদয়কে নিয়ে একবার উত্তরমুখে উড়ল, কিন্তু খানিক পথ গিয়েই বললে—"ভাই, বড় মন কেমন করছে, মানস-সরোবরের এই নাটবাড়ির চালায় দু-চারদিন কাটিয়ে চল বাড়িমুখো হওয়া যাক, দেশে যাবার জন্যে মন টেনেছে আর ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগছে না।"

রিদয়েরও মনটা সকাল থেকে দেশের দিকেই টানছিল, সে কোনো কথা কইলে না। খোঁড়া হাঁস আস্তে-আস্তে উড়ে এসে আবার নাটবাড়ির ধারে নামল ঠিক বেছে বেছে সেইখানটিতে, যেখানে তার বালিহাঁস রয়েছে। খোঁড়া রিদয়কে পিঠে থেকে নামিয়ে গলা উঁচু করে দুবার ডাক দিলে—"বালি ও বালি!" কোনো উত্তর এল না, তারপর ছুটে গিয়ে দেখলে পাথরের মধ্যে শুকনো ঘাস পাতা বিছানো তাদের দুদিনের বাসাটি খালি হা-হা করছে, কেউ কোথাও নেই। রিদয় চুপ করে রইল, ভাঙা গলায় খোঁড়া হাঁস আবার ডাক দিলে—"বালি কোথায় বালি!"

রিদয় ভাবছে নিশ্চয় শেয়াল এসে মরা হাঁসটা টেনে নিয়ে গেছে, ঠিক সেই সময় জলার ধারে বেনা-বনের সবুজ পাতাগুলো নড়ে উঠল, তার পরেই মিঠে সুরে—"এই যে আমি, একটু গা ধুয়ে নিচ্ছি" বলে বালি আস্তে-আস্তে জলা থাকে উঠে এল! তার ঝকঝকে পালকে শিশিরের মতো জলের ফোঁটাগুলি আলো পেয়ে হীরের মতো ঝকঝক করছে, রিদয়ের মনে হল যেন জলদেবী জল থেকে উঠে এলেন।

খোঁড়া হেলতে-দুলতে বালির কাছে গিয়ে আস্তে-আস্তে তার গলা চুলকে দিয়ে বললে—“বেদনা আছে কি?” বালি ঘাড় নেড়ে বললে—“একটুও না, তোমার বন্ধুর কৃপায় আর তোমার যত্নে আমি ভালো হয়ে গেছি।” তারপর দুজনে জলে গিয়ে সাঁতার আরম্ভ করলে, রিদয় জলের ধারে বসে একটা বেনার শিষ চিবোতে থাকল।

বালিহাঁসকে সঙ্গে নিয়ে খোঁড়া এর মধ্যে একদিন চুপিচুপি পদ্মবনে পদ্ম-ফুলের সোনালী রেণু এ-ওর গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই নিজেদের গায়ে হলুদ মেখে, মাছরাঙা পাখিদের বৌ-ভাতে মাছ খাইয়ে, বিয়ে-থাওয়া খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে জলার ধারে বাসা বাঁধবার যোগাড়ে আছে, দেশে ফেরার কিম্বা বিদেশে উড়ে চলার আর নামটি করে না। রিদয় শুধোলে বলে—“আমরা দুটিতে যেখানে থাকি সেইখানেই আমাদের দেশ।”

রিদয় বলে—“আমার তো দেশ আছে, আমাকে তো সেখানে যেতে হবে বিয়ে-থাওয়াও করতে হবে। এই জলার মধ্যে না পাওয়া যায় ভালো খাবার, না আছে ভালো শোবার জায়গা, এখানে বাসা বাধলে তো আমার চলবে না।”

বালিহাঁস বললে—“তা বেশ তো, এই জলার ওপারেই একটা গয়লাপাড়া আছে, চলুন আপনাকে তাদের গোয়ালে রেখে আসি। একটি বুড়ি গাই তাদের আছে এক ছটাক করে দুধ দেয়, দুধ ভাত সবই সেখানে পাবেন।”

রিদয় শুধালে—“আর তোমরা?”

বালিহাঁস লজ্জায় মুখটি নিচু করে রইল। খোঁড়া চুপি-চুপি রিদয়ের কানে-কানে বললে—“ভাই, ওর ডিম পাড়বার সময় হয়েছে, দুটো মাস অপেক্ষা কর, তারপরে সবাই এক সঙ্গে বাড়ি ফেরা যাবে, এই কটা দিন তুমি কোনো রকমে গৌহাটিতে কাটাও।”

হাঁসের বাচ্ছা হবে শুনে রিদয় ভারি খুশি, সে একখানা শালপাতার নৌকোতে ভর দিয়ে গয়লাপাড়ার ঘাটে গিয়ে উঠল। গয়লাপাড়ার নামেই পাড়া, একঘর বই গয়লা নেই, তাও আবার গয়লা-বুড়ো অনেককাল হল মরেছে, আছে কেবল এক বুড়ি গাই আর এক বুড়ি গয়লানী!

গয়লাবাড়ির উঠোনে ঢুকে রিদয় এদিক-ওদিক চাইতে লাগল, ঘুটঘুটে আঁধার রাতটা, বাড়ির কোথাও একটি আলো নেই, কোনদিকে গোয়াল কোনদিকে ঢেঁকিশাল কোথায় বা হেঁসেল কিছুই দেখবার যো নেই, একটা কেবল বেল গাছ ভূতের মতো এঁকে-বেঁকে টেরা-বাঁকা মোচড়ানো-দোমড়ানো শুকনো ডাল নিয়ে উঠোনের মাঝে দাড়িয়ে আছে, আর তার উপরে বসে একটা কালো পেঁচা কেবলি চেঁচাচ্ছে—“যো-মেঁ-র বাড়ি-যাঃ, মাথা খাঃ!”

ঝড় উঠল, তার সঙ্গে টিপটিপ বিষ্টি নামল, আরো দুটি পথিক নেউল আর খটাস তাড়াতাড়ি উঠোনে ঢুকে এদিক-ওদিক চাইতে-চাইতে রিদয়কে দেখে শুধোলে—“এটা কি গৌহাটির চটি, রাতে থাকবার ঘর পাওয়া যাবে কি এখানে?”

রিদয় বললে—“আমি তো গয়লাবাড়ি বলে এখানে ঢুকেছি কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখছিনে। এটা গোয়াল কি চটি কি

ধর্মশালা বা পাঠশালা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, কারু শাড়াশব্দ পাচ্ছিনে, কেবল একটা পেঁচা ডাকছিল একটু আগেই শুনেছি।”

খটাস বললে—“তবে নিশ্চয় এটা গঙ্গাযাত্রীর ঘর!”

নেউল বলে উঠল—“মাঠের মধ্যে কখনো মড়া পোড়াবার ঘাট হয়? বাড়িই বটে, তবে এটা কলুর বাড়ি কি গয়লাবাড়ি কিম্বা পুলিশের খাদাবাড়ি তা বোঝা যাচ্ছে না!”

খটাস বললে—“সেটা বোঝবার সহজ উপায় আছে।”

রিদয় শুধোলে—“কোনো বাড়ি সহজে চেনবার উপায়টা কি প্রকাশ কর!”

খটাস খানিক ভেবে বললে—“মানুষেরা নানা কাজের জন্যে নানারকম বাড়ি-ঘর বাঁধে তা তো জানো—উত্তরমুখো, দক্ষিণমুখো, পুবমুখো, পশ্চিমমুখো। গয়লা বাঁধবে একরকম, তেলি বাঁধবে অন্যরকম, মালি বাঁধবে একরকম, কুমোর বাঁধবে একরকম। আর্ট বোঝো না? কে কি রকম বাঁধবে তার হিসাবটা জানলেই কোনটা কি বাড়ি বোঝা যাবে।”

নেউল বললে—“হিসেবটা কেমন শুনি?”

“শোনো তবে, প্রথমে মালির বাড়ি কেমন তা বলি শোনো,” বলে খটাস খনার বচন আরম্ভ করলে:

চৌদিকে প্রাচীর উচা কাছে নাই গলি কুচা

পুষ্প বনে ঢাকে রবি শশি

নানা জাতি ফোটে ফুল উড়ি বৈসে অলি কুল

কোকিল কুহুরে দিবা নিশি।

মন্দ-মন্দ সমীরণ বহে সেথা অনুক্ষণ

বসন্ত না ছাড়ে এক তিল!

রিদয় বলে উঠল—“এখানে তো ফুলের গন্ধ মোটেই পাচ্ছিনে! তবে এটা মালির ঘর নয়।”

“আচ্ছা, গন্ধে-গন্ধে বোঝো এটা তেলির বাড়ি কিনা,” বলেই খটাস আবার শুরু করলে:

সরষের ঝাঁঝে তেলি হাঁচে ফ্যেঁচ-ফ্যেঁচ

বলদেতে ঘানি টানে ঘ্যেঁচ-ঘ্যেঁচ ভ্যেঁচ।

নেউল বাতাসে নাক উঁচিয়ে বললে—“কই হাঁচি তো পাচ্ছে না! তবে এটা তেলির বাড়ি নয়, মালির বাড়িও নয়।”

“কুমোর বাড়ি কিনা দেখ তো,” বলে খটাস শোলক আওড়ালে:

হাঁড়ি পাতিল ঠুকুর ঠাকুর কলসীর কাঁধা

পাতখোলার সোঁদা গন্ধ কুমোর বাড়ি বাঁধা।

রিদয় এদিক-ওদিক নাক ঘুরিয়ে বললে—“নাঃ, কোনো গন্ধই পাচ্ছিনে!”

“আচ্ছা দেখ দেখি গয়লাবাড়ি কিনা” :

গোয়াল ঘরে দিচ্ছে হামা নেহাল বাছুর

ঘোল মউনি বলছে ঘরে গাবুর গুবুর

ভালো দুধ টোকো দই দিচ্ছে সেথা বাস

মোষ দিচ্ছে নাক ঝাড়া গরু চিবায় ঘাস।

রিদয় পুবদিকে নাক তুলে বললে—“এসব কিছুই নেই এখানে!”

নেউল পশ্চিম দিকে শুঁকে-শুঁকে বললে—“যেন ভিজে ঘাসের গন্ধ পাচ্ছি!”

খটাস উত্তর-দক্ষিণ পুর্ব-পশ্চিম চারদিকে কান পেতে নাক ঘুরিয়ে বললে—“এটা গয়লাবাড়ি বটে, কিন্তু তেমন গোঁড়া গয়লা নয়, শব্দ আর গন্ধগুলো কেমন ফিকে-ফিকে ঠেকছে, বিচিলী আছে, ঘাসও কিছু আছে, গরুও একটা যেন আছে বোধ হচ্ছে।”

ঠিক সেই সময় বুদিগাই “ওমঃ” বলে একবার ডাক দিলে! তিন পথিক তাড়াতাড়ি সেই দিকে গিয়ে দেখলে—কত কালের পুরোনো চালাখানা তার ঠিক নেই, বিষ্টির জলে মাটির দেওয়াল গলে গিয়ে বুড়ো মানুষের পাঁজরের হাড়গুলোর মতো ভিতরের চাঁচ আর খোঁটাখুঁটি বেরিয়ে পড়েছে, দরজায় একটা ঝাঁপ খুলে মাটিতে শুয়ে পড়েছে, আর একটা পচা দড়ি ধরে পড়ো-পড়ো হয়ে এখনো ঝুলে রয়েছে! চালের খড় এখানে-ওখানে উড়ে গিয়ে ভিতর থেকে ঘুণ-ধরা বাঁশের আড়া দু-চারটে ফোগলা দাঁতের মতো দেখা যাচ্ছে!

তিন পথিকের পায়ের শব্দ পেয়ে গোয়ালের মধ্যে থেকে বুদি ভাবলে গয়লাবুড়ি তার জাব নিয়ে এল—সে দরজা থেকে মুখটা বাড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখে বললে—“মাগোঃ মাঃ, রাত হল আজ কি খেতে দিবিনে!”

খটাস, রিদয় আর নেউল বুদির কথার উত্তর দিলে—“তিন

পথিক মোরা, রাতের মতো জায়গা মিলবে কি?”

বুদি মাথা হেলিয়ে কেবলি শুধাতে লাগল—“কেগাঃ কে?”

রিদয় বললে—“আমি আমতলির তাঁতির পুত্তুর শাপভ্রষ্ট বুড়ো-আংলা দেশভ্রমণে বেরিয়েছি।”

বুদি নেউলের দিকে শিং হেলিয়ে বললে—“ইনি?”

“নেউল পুত্তর ইনিও বেরিয়েছেন মৃগয়া করতে।”

খটাসের দিকে চোখ ফিরিয়ে বুদি রিদয়কে শুধালে—“আর ইনি কে?”

“ইনি হচ্ছেন খটাসের পুত্তুর, দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন।”

বুদি গোয়ালের দুয়োর ছেড়ে একপাশ হল, তিন বন্ধুতে বাদলার রাতে গোয়ালে আশ্রয় নিয়ে রাত কাটাবার যোগাড় করতে চলেছেন, বুদিগাই লেজ নেড়ে বললে—“আর জন্মে কত তপিস্যি করেছি, তাই কাঙালিনীর ঘরে রাজপুত্তুর, পাত্তরের পুত্তুর আর কোটালের পুত্তুরের পা পড়ল!” রিদয় খুশি হয়ে বুদির ঘাড়টা একটু চুলকে দিলে, তারপর খড়ের গাদায় শুয়ে তিন বন্ধুতে চোখ বুজলে।

এদিকে বুদিগাই সারাদিন জাব পায়নি, সে পেটের জ্বালায় কেবলি উসখুস করছে—“ওমঃ মাগোঃ, কোথায় গেলে আজ কি আর খাব না? ও ভাই রাজপুত্তর মাচানের উপর থেকে এক বোঝা খড় নামিয়ে দিতে পার, বড় খিদে লেগেছে!”

রিদয় দেখলে চালের বাতায় মস্ত এক বোঝা খড় চাপানো রয়েছে বটে, কিন্তু সেটা টেনে নামানো রিদয়ের সাধ্যি নয়,

একটা আঁটি কোনো রকমে টেনে রিদয় বুদির মুখের কাছে ধরে দিলে। গাই খড়গুলো মুখে নিয়ে জাবর কাটতে লাগল।

রিদয়ের একটু তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় বুদি আবার বলে উঠল—"ওমা গো, ভাই পাত্তরের পুত্তুর একটুখানি জল এনে দিতে পার?"

নেউল ঘুমের ঘোরে বললে—"এত রাতে জল পাই কোথা!"

বুদি বিনয় করে বললে—"বাইরেই বিষ্টির জল জমা হয়েছে, উঃ বড় তেষ্টা, আমার গলার দড়িটা যদি খুলে দাও তো ওখানে গিয়ে একটু জল খেয়ে বাঁচি!"

নেউল বুদির গলার দড়িটা দাঁতে কেটে দিয়ে বললে—"যাও তবে!"

বুদি দু-পা গিয়ে বললে—"ইস ভারি অন্ধকার, ভাই কোটালের পুত্তুর।"

খটাস আধবোজা চোখ মেলে বললে—"কি?"

বুদি একে রাতকানা তাতে আবার কানে কালা হয়েছে, খটাস কি বললে—শুনতেই পেলে না। আবার ডাকলে—"ও ভাই কোটালের পুত্তুর আমি রাতকানা, যদি গলার দড়িটি ধরে একটুখানি এগিয়ে দিয়ে এস তো ভালো হয়!"

"ভালো বিপদেই পড়া গেল," বলে খটাস দড়িটা ধরে বুদিগাইকে উঠানের মাঝে টেনে নিয়ে অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে সরে পড়ল!

রাত তখন বারোটা, খড়ের গাদায় তিন বন্ধুতে আরামে

নিদ্রা যাচ্ছে, এমন সময় বুদিগাই এসে সবার কানে কানে বললে—“বড় বিপদ, বুড়িটা মরে গেছে!”

রিদয় তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বললে—“সেকি! মরলো কেমন করে?”

বুদি নিশ্বেস ফেলে বললে—“দুঃখের কথা কইব কি, এই সন্ধ্যেবেলা সে আমার গলাটি ধরে বলে গেল—‘বুদি শুনেছিস এই নাটবাড়ির জলায় রাজা এবার ধান বোনবার হুকুম দিয়েছেন, এতকালে জমি সব আবাদ হবে; আমাদেরও দুঃখু ঘুচবে।’ আমি বললেম—‘মা, তোমার আর দুঃখু ঘুচবে কি, তোমার ছেলেপুলে ক’টাই বিদেশে গিয়ে সংসার ফেঁদে কাজ-কারবার করতে বসে গেল, বুড়ি মাকে তো তারা একটিবার মনেও করলে না!’ মা বললে—‘বুদি লো বুদি, তাদের দুষিসনে, ঘরের ভাত পেলে কি তারা আমাকে একলা ফেলে বিদেশে যায়, না পরের চাকরি করে? এইবার তাদের চিঠি দেব দেখিস কেমন না তারা আসে। আমার মরবার সময় সব ছেলেরা এসে আমায় ঘিরে দাঁড়াবে আর আমি ডঙ্কা মেরে স্বর্গে চলে যাব এই সাধটি আমার কি পূর্ণ হবে বুদি!’ এই বলে মা ঘরের মধ্যে চিঠি লিখতে গেল, গোয়াল-ঘরে আর জাবও দিতে এল না, পিদুমও জ্বাললে না! সন্ধ্যেবেলা মাকে যেন কেমন-কেমন দেখনু, তাই বলি একবার যাই দেখে আসি। ওমা, ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি যেখানকার যেটি সব তেমনি গোছানো রয়েছে—পিদুমটি জ্বলছে বিছানা পাতা রয়েছে কিন্তু মা আমার চিঠিটুকু হাতে নিয়ে আলুথালু হয়ে দরজার ধারে পড়ে রয়েছেন, ছেলেরা আসবে ছেলেরা আসবে

করেই বুড়ি মলো গো!”

“আহা! এই গয়লা-বোয়ের দশা কি এমন ছিল। এই বাড়িতে দেখেছি ছেলে-মেয়ে চাকর-বাকর গিসগিস করছে— ঐ নাটবাড়ির সমস্ত জলাটা ওদের জমিতে পড়েছে, আজ এখনো কত জমি যে বেখবর পড়ে আছে তার ঠিক নেই। কর্তা যতদিন ছিলেন যেমন বোলবোলা তেমনি লক্ষিরছিরি। আহা, ওই গয়লা-বৌ তখন দুবেলা সেজেগুজে পাঁচজন গয়লানী সঙ্গে গাই দোহাতে আসত, নূপুরের শব্দ শুনলে গাই-গরু সব চারদিক থেকে হামা দিয়ে ছুটে আসত গো। এমন লক্ষী বৌ কচি-কাচা নিয়ে বিধবা হল গো! তখন এক-একদিন সে আমার গলা ধরে কানতো আর বলত—‘বুদি, আর পারিনে যন্ত্রণা সইতে।’ আমি বলি, ‘মা এই শরীর তোমার, একা সবদিক দেখা কি তোমার কর্ম, দু-চারটে দাস-দাসী নায়েব-গোমস্তা বেশি রাখলে হয় না?’ কিন্তু সে বড় কর্মিষ্টি, নিজের হাতে ছেলে-মানুষ ধান-বোনা রান্না-করা গাই-দোয়া সব করবে! আমি বলি—‘মা, শরীর যে ক্ষেয় হল!’ কিন্তু বৌ কেবলি বলে—‘ভালো দিন আসছে বুদি আসছে!’ আর ভালো দিন! ছেলেগুলো বড় হয়ে চাকরির চেষ্টায় বিভুঁয়ে বিদেশে টো-টো করে ঘুরতে লাগল, কেউ বিদেশ গিয়ে সংসার পাতলে, ছেলেপুলে হল কিন্তু বুড়িকে আর কেউ দেখলে না। জমিজমা গহনা-গাঁটি বেচে ছেলে-মেয়ে নাতি-পুতি এমনি তিনপুরুষ ধরে সবাইকে বিয়ে দিয়ে চাকরি নিয়ে বিদেশে পাঠাতে-পাঠাতে বুড়ি ক্রমে সর্বস্বান্ত হয়ে না খেয়ে মরবার দাখিল হল! ছেলে-মেয়ে কত যে জন্মাল, মানুষ হল, বড় হয়ে বুড়িকে একলা রেখে চলে গেল,

এই গয়লাবাড়িতে ক'পুরুষ ধরে কত কারখানাই দেখলুম যে, তা কি বলি!"

"এদানি বুড়ি আর দুঃখু করত না, ছেলেদের কথা হলে বলত—'বুদি এখানে এলে তাদের তো কষ্ট বই আরাম হবে না, তবে কেন আর তাদের ডেকে পাঠাই; এই তো ভাঙাবাড়ি, এখানে জায়গা কোথায় তাদের বসবার শোবার খাবার! ওই বাপ-মা-হারা আমার শিবরাত্রির সলতে ওই ছোট নাতিটি বেঁচে থাক, মরবার সময় তবু মুখে একটু জল দেবার একজন তো রইল—কি বলিস!' কিন্তু এ নাতিও বড় হয়ে যেদিন কুলির সর্দারি করতে বিদেশে গেল সেদিন থেকে বুড়ির আর চোখের জল থামল না। সে দিন-দিন কুঁজো হয়ে পড়ল, হাল-গরু জোত-জমা সমস্ত পাঁচ ভূতে লুঠে পালাল, বুড়ি দেখেও দেখলে না—শেষে এখানে আর কেউ রইল না—এই বুদি আর ওই বুড়ি ছাড়া। বুড়ি খেতে পায় না দেখে আমি একদিন বললুম–'মাগো, কসায়ের কাছে আমাকে বেচলে তো পয়সা পাও, তা কর না কেন!' বুড়ি আমার গলা ধরে বললে—'বুদি সব ছেলে-মেয়ে তোর দুধ খেয়ে মানুষ হল তোকে আমি কি ছাড়তে পারি!' আহা সেই আমার সেঙাতনী মনিবনী, গিন্নি মা-জননী আজ নিজেই চলে গেল গোঃ, ওমা" —বলে সে অঝোরে কাঁদতে লাগল।

রিদয় অনেকক্ষণ চুপ করে থেকেই বললে—"আহা বুদি, আমতলিতে মাকে আমি এমনি করে ফেলে এসেছি যে!"

বুদি বলে উঠল—"যাও কালই ফিরে যাও, না হলে হয়তো এই বুড়ির মতো ছেলে-ছেলে করে শেষে সেও মরবে। তোমার

তো এখনো গিয়ে মাকে দেখবার সময় আছে কিন্তু এই বুড়ির ছেলেরা কি পোড়াকপাল নিয়েই জন্মেছিল, কখনো দেশেও এল না, মা মরে গেল তাকেও দেখতে পেলে না!”

সকাল বেলায় মিউনিসিপালের মুর্দোফরাসগুলো এসে বুড়িকে পোড়াতে নিয়ে গেল, খটাস চলে গেল দিগ্বিজয়ে, নেউল চলে গেল মৃগয়াতে, রিদয় বুড়ির ঘর থেকে তার ছেলেদের নামের চিঠিখানি ডাকে ফেলে দিয়ে বুদিকে মাঠে রেখে খোঁড়ার কাছে ফিরে চলল। পাতি-জলার কাছ বরাবর এসে রিদয় দেখলে খোঁড়া হাঁস সকালে উঠে জলের মাঝে একটা মাটির ঢিপিতে দাঁড়িয়ে ডানা ঝাড়ছে, বালি হাঁস তখনো ঝোপের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। রিদয় সারারাত কিছু খায়নি, হাঁসের কাছে না গিয়ে সে বরাবর বুদিগাইটার পিছনে-পিছনে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল। দু-একটা পাত-বাদামের চেষ্টায় রিদয় একটা শিরিষ গাছের উঁচুডালে কাঠবেরালিদের ঘরে ভিক্ষে করতে চলেছে। মস্ত শিরিষ গাছ, তার সব উপরের ডালে কাঠবেরালিদের খোপ বসতি, ঝোপ বসতি। এমনি এপাড়া-ওপাড়ায় রিদয় “জয় রাম” বলে গান গেয়ে দাঁড়াচ্ছে আর কেউ এসে তাকে দুটো শুকনো ছোলা, কেউ একটা বাদাম, এমনি টুকি-টাকি ভিক্ষে দিচ্ছে। রামের দোহাই দিলে কাঠবেরালিদের ভিক্ষে দিতেই হয়, কিন্তু এক-এক কাঠবেরালি গিন্নি ভারি কিপটে, রিদয়কে দূর থেকে দেখেই বলছে—“ওগো ঘরে কিছু নেই, কর্তা হাটে গেছেন, ওবেলা এস—এখন কিছু হবে না।” রিদয় পাকা ভিখিরী, সহজে ছাড়বে কেন, গান শুরু করলে:

বাসনা করায় মন পাই কুবেরের ধন

সদা করি বিতরণ তুমি যত আশ না

আস নাই আরো চাই ইন্দ্রের ঐশ্বর্য পাই

ক্ষুধা মাত্র সুধা খাই মরি-মরি ফাঁস না

ফাঁসনা কেবল রৈল বাসনা পূরণ নৈল

লাভে হতে লাভ হৈল লোকে মিথ্যা ভাসনা!

কাঠবেরালি গিন্নি এতেও সাড়া দেয় না, রিদয় এবারে হিন্দি গান ধরলে:

ধুম বড়া ধুম কিয়া খানে জোনে নাহি দিয়া

চহুঁয়ার ঘেরলিয়া ফোজ কি গিতাপয়া!

আরে চহুঁয়ার, আরে চহুঁয়ার।

এক থোকা শিরীষ-ফুলের তলায় দাঁড়িয়ে বুড়ো-আংলা পেট বাজিয়ে গাইছে, এমন সময় মনে হল তার কোমরের কাপড় ধরে কে টান দিচ্ছে, রিদয় ফিরে দেখতেই একটা কাক 'খাও' বলে তার ঠোঁট আর ডান হাতটা চেপে ধরলে, অমনি আর একটা কাক, তারপর আর একটা আর একটা এসে রিদয়কে ছোঁ দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলল। ডোম-কাকের দল রিদয়কে চোখে-মুখে কিছু দেখতে দিচ্ছে না—"যক-যকা" বলে এর মুখ থেকে ও, তার মুখ থেকে সে, এমনি রিদয়কে ফুটবলের মতো ছুঁড়ে দিতে-দিতে দল বেঁধে গোলমাল করতে-করতে চলছে দেখে বুদি গাই "ওমা-ওমা" করে চেঁচাতে-চেঁচাতে লেজ তুলে ছুটোছুটি করতে লাগল। ইচ্ছেটা কাকগুলোকে শিং দিয়ে গোঁতায়, কিন্তু তারা আকাশে সে বেচারা মাটিতে—

বুদি কেবল ধুলো উড়িয়ে মাঠে ছুটোছুটি করতে লাগল!

খোঁড়া হাঁসও আকাশে কাক দেখে—"ক্যা-ক্যা" বলে একবার ডাক দিলে, কিন্তু দেখতে-দেখতে কাকের দল অদৃশ্য হয়ে গেল।

রিদয় চটকা ভেঙে যখন চেয়ে দেখলে, তখন কাকেরা পাতি-জলা পেরিয়ে নাটবাড়ি ছাড়িয়ে কাকচিরের দিকে চলেছে। হাঁসের পিঠে আরামে উড়ে চলা এক, আর কাকের ঠোঁটে ঝুলতে-ঝুলতে চলা অন্য একরকম। রিদয় দেখলে জলা-জমি যেন একখানা ফাটা-ফুটো গালচের উল্টো পিঠের মতে পায়ের তলায় বিছানো রয়েছে, সবুজ লাল কালা কত রকমের যেন সুয়োঁ-ওঠা পশমে বোনা, বাঙলাদেশের পরিষ্কার ছক-কাটা জমির মতো মোটেই নয়, জলগুলো দেখাচ্ছে যেন মাঝে-মাঝে ছোট বড় আয়না ভাঙা।

দেখতে-দেখতে সূর্যি উঠল, আলো পেয়ে মাটি যেন সোনা রুপো আর নানা রঙের উলে-বোনা কাশ্মীরী শালের মতো দেখাতে লাগল। তারপরে জলা পার হয়ে বন-জঙ্গল মাঠ-ঘাটের উপর দিয়ে কাকেরা রিদয়কে নিয়ে উড়ে চলল! কাকেরা তাকে ধরে নিয়ে কোথায় চলেছে, কোথা রইল খোঁড়া হাঁস, কোথায় বা চকার দল, কোথা বুদি, কোথা বালি!

রিদয় ভয় পেয়ে চারদিক চাইছে এমন সময় ডোমকাকে ডাক দিলে—"খবরদার" অমনি সব কাক রিদয়কে নিয়ে জঙ্গলের তলায় নেমে পড়ল। চোরকাঁটার বনে রিদয়কে ঠেলে ফেলে গোটা পঞ্চাশেক কাক সঙিনের মতো ঠোঁট উঠিয়ে তার চারদিকে পাহারা দিতে দাঁড়িয়ে গেল।

রিদয় গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বললে—“তোরা যে আমাকে বড় ধরে আনলি!”

ডোমরাজা দৌড়ে এসে বললে—“চুপ, কথা কবি তো চোখ ঠুকরে নেব!” .

রিদয় বুঝলে এবার সহজে ছাড়ান নেই, এরা সব ডাকাতে-পাখি! গোলযোগ করলে হয়তো মাথাটাই ফাটিয়ে দেবে। সে কি করে, শুকনো মুখে কাকগুলোর দিকে চেয়ে রইল। কাকগুলোও তাকে ঘিরে ধারাল ঠোঁট বাড়িয়ে একচোখে তাগ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

দূর থেকে দেখে রিদয় ভাবত কাকগুলো বেশ কালো চিকচিকে, যেন কালো আলপাকার চায়না-কোট পরা নতুন উকিল কৌঁছিলের মতো, চালাক চতুর চটপটে। কিন্তু কাছ থেকে কাকগুলোকে রিদয় দেখলে কদাকার কালো কুচ্ছিত যতদূর হতে হয়, পালকগুলো রুখো মড়মড়ে যেন কালিতে ছুপোনো তালপাতা, পাগুলো গেঁটে-গেঁটে কাদামাখা খরখরে, ঠোঁটের কোণে এঁটো ঝোলঝাল মাখানো; একটা চোখ যেন ছানি পড়া আর একটা যেন ময়লা পয়সার মতো তামাটে কালো! কোথায় শাদা ধপধপে সুবচনীর হাঁস আর কোথায় এই কালো কুচ্ছিত কাগের ছা সব!

রিদয় এই কথা ভাবছে এমন সময় মাথার উপরে অনেক দূর থেকে হাঁসের ডাক এল—“কোথায়—কোথায়?” রিদয় গলা শুনে বুঝলে খোঁড়া তার সন্ধানে চলেছে, সেই সঙ্গে-সঙ্গে বালি হাঁসও ডাক দিয়ে গেল “সেঙাত-সেঙাত!” বনের ওধারটায় বুদিও একবার হাক দিলে—“ওগোঃ ওগোঃ!” রিদয়

বুঝলে তিনজনেই এসেছে, সে অমনি হাত নেড়ে হেথায় বলে চেঁচাতে যাবে আর ডোমরাজা ছুটে এসে ধমকে বললে—“কিও! আয় দিই চোখ দুটো খুবলে!” রিদয় অমনি মুখ বুজে গোঁ হয়ে বসল।

হাঁসেরা চলে গেল বুদি গাইও ডেকে-ডেকে থামল, তখন ডোমকাক হুকুম দিলে—“উঠাও!” দুটো কাক তাকে আবার ঠোঁটে ঝুলিয়ে নিয়ে ওড়বার চেষ্টায় আছে দেখে রিদয় বললে—“বাপু তোমাদের মধ্যে কেউ পালোয়ান কাক থাকে তো আমাকে পিঠে করে নিয়ে চল, অমন ঝোলাখুলি করলে আমার হাত পায়ের জোড় সব খুলে যাবে যে!”

ডোমকাক ধমকে বললে—“চল-চল, অত বাবুগিরিতে কাজ নেই। কাগে চড়বেন এত সুখ তোর কপালে—আমরা কি ঘোড়া যে তোকে পিঠে নেব।”

এবারে ঝোড়োকাগ এগিয়ে এসে বললে—“মহারাজ, মানুষটাকে হাড়গোড় ভেঙ্গে দ করে নিয়ে গেলে তো ওটা আমাদের কোনো কাজে আসবে না, আমি বরং ওকে পিঠে নিই, কি বলেন?”

ডোমকাক মুখ সিঁটকে বললে—“তোমার ইচ্ছে হয় তো ওর পালকি-বেহারার কাজ করতে পার, কিন্তু দেখ পালায় না যেন!”

রিদয় দেখলে ঢোঁড়াকাগটা ওর মধ্যে দেখতে-শুনতে ভদ্দর রকম, সে আস্তে-আস্তে তার পিঠে চড়ে বসল।

কাকের দল ক্রমাগত দক্ষিণ মুখেই উড়ে চলেছে। পরিষ্কার

দিনটি খটখট করছে, চারদিকে যেন বাতাস আর আলো ছড়িয়ে পড়েছে, বনের শিয়র দিয়ে রিদয়কে নিয়ে কাকরা উড়ে চলল।

রিদয় দেখলে বৌ-কথা-কও পাখি বকুল গাছের আগডালে বসে বৌকে শুনিয়ে কেবলি গাইছে—“কথা কও বৌ কথা কও, মাথা খাও বৌ কথা কও!” রিদয় অমনি বলে উঠল—“কথা কইবে কি ছলে, কথা শুনলে গা জ্বলে!”

“কে রে?” বলে হলদী পাখি আকাশের দিকে ঘাড় তুলতেই, রিদয় তাকে শুনিয়ে বললে—“কাকে-ধরা যক্! কাকে-ধরা যক্!”

ডোমকাক অমনি ধমকে উঠল—“আবার কথা!”

আরো দক্ষিণ-মুখো গিয়ে রিদয় দেখলে আমবাগানের মাথায় ঘুঘু বসে তার বৌকে গান গেয়ে ঘুম ভাঙাচ্ছে আর গলা ফুলিয়ে আদর করে ডাকছে—“বুবু ওঠো দেখি মম্।”

রিদয় অমনি বলে উঠল—“আদর দেখ উহুঃ।”

ঘুঘু গলা তুলে বললে—“কে রে কে রে?”

রিদয় তাকেও শুনিয়ে দিলে—“কাকে ধরা যক্!”

এবার ডোমকাক রেগে রিদয়কে ডানার থাপ্পড় দিয়ে বললে—“ফের বকচিস, চুপ!”

ঢোঁড়াকাক বলে উঠল—“বকুক না যত পারে, পাখিগুলো ভাবচে আমরাও ঠাট্টা-তামাশা শিখেছি।”

ডোমকাক আর উচ্চবাচ্য করলে না। রিদয় ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে

সব পাখিকে জানিয়ে দিতে-দিতে চলল—তাকে কাকে ধরেছে!

এমনি বন ছাড়িয়ে তারা একটা নগরের উপরে এসে পড়ল। নদীর ধারে মস্ত শিব-মন্দির, তারি চূড়োয় ত্রিশূলের ডগায় বসে শালিক তার বৌকে শুনিয়ে রাগরাগিনীতে গলা সাধছে; বৌ তার পঞ্চবটির বাসায় ডিমে তা দিচ্ছে আর কর্তার গান শুনছে—"সা রে গা মা পা—চারটে ডিমে তা, ধা নি সা—দুই জোড়া ছা!"

রিদয় অমনি আকাশ থেকে বলে উঠল—"কাগে খাবে গা!" শালিক "কেও?" বলে মুখ ফেরাতেই রিদয় শুনিয়ে দিলে—"কাগে ধরা যক্।"

যতই দক্ষিণ দিকে এরা এগোতে থাকল ততই বড়-বড় নদী খাল-বিল ক্ষেত মাঠ-ঘাট গ্রাম-নগর দেখা দিতে থাকল। একটা মস্ত বিলের ধারে একটা হাঁস আর একটা হাঁসের সামনে দাঁড়িয়ে কেবলি ঘাড় নাড়ছে আর বলছে, "চেয়ে দেখ্ আমি তোরি চিরদিন আমি তোরি।"

রিদয়ের মনে হল যেন খোঁড়া আর বালি দুজনে কথা কইছে; সে অমনি তাদের শুনিয়ে বলে উঠল—"এসা দিন রহে থোড়ি রহে থোড়ি!"

"কেও—কেও?" বলে হাস মুখ ফেরাতেই রিদয় শুনিয়ে দিলে—"কাগে ধরা যক্!" এমনি যাকে দেখে, তাকেই নিজের খবর শুনিয়ে দিতে-দিতে রিদয় চলেছে!

বেলা দুপুর, কাকের ঝাঁক এক মঠের জমিতে নেবে সড়া পেসাদ খেতে আরম্ভ করলে। রিদয় খেলে কিনা সে দিকে

কারু লক্ষ্য নেই। ডোমকাক রিদয়কে আগলে বসে আছে, এমন সময় ঢোঁড়াকাক একটা ডালিম এনে ডোমকাককে বললে—“মহারাজ দুটো ফল খেতে আজ্ঞে হোক্!” ডালিম ভাঙা কাকের কর্ম নয়, তা ঢোঁড়াকাক জানত—ডোম-রাজা নাক তুলে বললে—“ওই শুকনো ফল আমি খাব, থুঃ!” ঢোঁড়া অমনি সেটা রিদয়ের পায়ের কাছে ফেলে তাড়াতাড়ি রাজার জন্যে যেন ভালো ফল আনতেই যাচ্ছে এইভাবে ছুটে পালাল। রিদয় বুঝলে ঢোঁড়া তার জন্যেই ডালিমটা এনেছে; সে অমনি সেটা দাঁতে চিবিয়ে ছালসুদ্ধ খেয়ে ফেললে।

ভাত খেয়ে ডোমরাজ মঠের চুড়োর উপরেতে গেলেন, অন্য সব কাক খেয়ে-দেয়ে পেট ভরিয়ে রিদয়কে ঘিরে গান গল্প শুরু করলে। পাতিকাক দাঁড়কাককে শুধোলেন—“দাদা চুপচাপ ভাবছ কি শুনি!”

দাঁড়কাক গলা খাঁকনি দিয়ে বললে—“ভাবছিলেম এই তল্লাটে এক মিয়া সাহেব একটি মুরগি পুষেছিল, মুরগি ঐ মোছলমানের বিবিকে এতো ভালোবাসতো যে তাকে খাওয়াবার জন্যে লুকিয়ে বিবির পানের ডাবরে গিয়ে চারটে করে ডিম পেড়ে আসত। মিয়া ডিম খুঁজে-খুঁজে হয়রান, তখন কিন্তু আমাদের মধ্যে কে একটা চালাক কাক সেই লুকানো ডিম খুঁজে বার করেছিল, না? তার নামটা কি মনে পড়ছে না। সে কি তুমি না আমি, না ওই ডোম না এই ঝোঁড়োকাক?”

পাতিকাক বলে উঠল—“ওঃ! বুঝেছি, আচ্ছা শোনো দেখি বলি, বোষ্টম-বাড়ির সেই কালো বেরালটাকে মনে আছে তো? সেই যেটা বোষ্টম বোয়ের হেঁসেলের মাছ রোজ নিয়ে পালাত,

কোথায় সে লুকিয়ে মাছটা রাখত তা বোষ্টম না বোষ্টমী না কালো কেউ টের পেত না, সেই মাছের সন্ধান কে-কে পেয়েছিল দাদা, তুমি না আমি, রাজা না মন্ত্রী?”

সব কাক অমনি এগিয়ে এসে নিজের-নিজের বড়াই করতে আরম্ভ করলে। কেউ বললে—“মাছ চুরি আবার একটা কাজের মধ্যে, আমি একবার একটা খরগোসের লেজ ঠুকরে দিয়েছিলেম; আর একটু হলেই সেটাকে নিয়ে চিলের মতো ছোঁ দিয়ে উড়েছি আর কি, এমন সময় সেটা তার গর্তে সেঁধিয়ে গেল!”

আর এক কাগ বলে উঠল—“আরে বাবা খরগোসছানা বেরালছানা এদের নিয়ে খেলা করছ—মানুষের কাছে কখন এগিয়েছ? আমি একবার ফিরিঙ্গির বাড়িতে গিয়ে তাদের টেবিলের রূপোর কাঁটা চামচে চুরি করে সাফ বেরিয়ে এসেছি, একটি পালকে পর্যন্ত আঁচড় লাগেনি!”

রিদয় থেকে-থেকে বলে উঠল—“এই বিদ্যের আবার এত বড়াই, এই বেলা ওসব চুরিচামারি ছাড়, না হলে মানুষ বিরক্ত হয়ে একদিন এমন গুলি চালাতে আরম্ভ করবে যে কাকবংশ ধ্বংস করে তবে ছাড়বে!”

“কি বলিস?” বলে সব কাক রিদয়কে তেড়ে এল, মনে হল এখনি তাকে ছিঁড়ে খাবে।

ঢোঁড়াকাক তাড়াতাড়ি সবাইকে ঠাণ্ডা করে বললে—“ছেলেমানুষ কি বলতে কি বলেছে। থাম হে ওকে মেরো না, রাজা তাহলে ভারি দুঃখিত হবেন! মনে নেই সেই যকের ধনটা বার করা চাই। ছোঁড়াটা না হলে সে কাজটা করে কে? তাছাড়া এটা

মানুষ, একে মারলে পুলিশ হাঙ্গামা হতে পারে।"

কাকেরা রিদয়কে আর কিছু না বলে ঢোঁড়াকেই ধমকাতে লাগল—"হাঃ মানুষ, ভারি তো উনি বড়লোক যে ভয় করতে হবে, ঢের-ঢের অমন মানুষ দেখেছি—"

এই সময় ডোমকাক উপর থেকে হাঁক দিলে—"চালাও!" এবারে কাকের দল রিদয়কে নিয়ে কাকচিরার পতিত জমির দিকে চলেছে—গ্রাম নগর আর দেখা যাচ্ছে না, কেবল ধূ-ধূ বালি আর কাঁটাগাছ। মানুষ নেই, গরু নেই, পাখি নেই—কেবল আগুনের মতে রাঙা সূর্যটা পশ্চিম দিকে ডুবছে—সমস্ত আকাশে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়ে।

ভর সন্ধ্যাবেলা ডোমকাক রিদয়কে ধরে নিয়ে কাকচিরার জঙ্গলে এসে নামল। ডোমকাক দূত হয়ে আগে গিয়ে সবার বাসায় খবর দিলে রাজা এলেন, অমনি সব কাকিনী "বা-বা-বা তোবা-তোবা" বলে বাসা ছেড়ে তামাশা দেখতে ছুটল।

শেয়ালের দল আহ্লাদে লেজ ফুলিয়ে হাঁক দিলে—"হুয়া—কয়েদ হুয়া, তোফা হুয়া!" চারদিকে হৈ-চৈ—ক্কা-ক্কা-হুয়া শব্দ উঠেছে, তারি মধ্যে ঢোঁড়া রিদয়ের কানে-কানে বললে—"আমি তোমার দিকে আছি, দেখ খবরদার ওদের কথা শুনে কোনো কাজ কর না। কাজ করিয়ে নিয়েই তোমায় মেরে ফেলবে, সাবধান।"

ডোমকাক এসে রিদয়কে টানতে-টানতে সেওড়াগাছের গোড়ায় গর্তটার মধ্যে নামিয়ে দিলে, রিদয় যেন জেরবার হয়ে পড়েছে এমনিভাবে আধমরার মতো গর্তের মধ্যে শুয়ে

পড়ল। ডোম রাজা ডাকলে—“ওঠ, যা বলি তা কর।” রিদয় যেন শুনতেই পেলে না, চোখ বুজে রইল। ডোম তাকে ধরে যকের পেঁটরার কাছে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে বললে—“খোল্ এটা।”

রিদয় ধাক্কা দিয়ে ডোমকে সরিয়ে বললে—“খিদেয় পেট জ্বলছে এখন আমি কাজ করব? আজ রাত্তিরটা না ঘুমিয়ে নিলে আমি কিছু কাজ পারব না, গা-হাত-পা টাটিয়ে গেছে।”

“খোলো আভি!” বলে ডোম রিদয়কে ঝাপটা মেরে পেঁটরার গায়ে ঠেলে দিলে; রিদয় গোঁ হয়ে পেঁটরা ধরে নেড়ে বললে—“বাবা, যে মরচে-ধরা তালা, এ তো খোলা সহজ নয়, আজ খেয়ে-দেয়ে গায়ে জোর হোক, কাল তখন দেখা যাবে!”

ডোম রেগে রিদয়ের গায়ে এক ঠোকর বসিয়ে বললে—“খোল্ বলছি!”

রিদয় এবারে আর রাগ সামলাতে পারলে না, ডোমকে এক থাপ্পড় কসিয়ে কোমর থেকে ছুরি বার করে বললে—“ফের বজ্জাতি, পাজি কোথাকার!”

ডোমকাক রাগে আর চোখে দেখতে পাচ্ছে না—“তবে রে” বলে সে রিদয়ের উপরে যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ল, অমনি রিদয় ছুরিটা তার চোখে বসিয়ে দিলে। ডোমকাক দু’বার ডানা ঝটপট করেই অক্কা পেলে।

“হত্যা হুয়া, হত্যা হুয়া,” বলে শেয়াল চেঁচাতে লাগল, “ক্যা-ক্যা” বলে কাকরা গোলমাল করে তেড়ে এল। ঢোঁড়া বোকা সেজে কেবলি রিদয়কে আড়াল করে-করে ডানা ঝাপটাতে

লাগল, যেন কতই রেগেছে এইভাবে। রিদয় বিপদ গুণে পেঁটরাটা জোরে টেনে খুলে তার মধ্যে লুকোবার চেষ্টা করতে লাগল। পেঁটরাটা কিন্তু টাকায় পয়সায় ঠাসা, তার মধ্যে জায়গা নেই দেখে দু-চার মুঠো পয়সা বাইরে ছড়িয়ে ফেললে!

এতক্ষণ কাকরা হট্টগোল করছিল যেন কাঙালী বিদেয়ের ভিড় লাগিয়েছে। পয়সা পড়তে সবাই ছোঁ দিয়ে এক-একটা তুলে বাসার দিকে দৌড়—চকচকে পয়সা পেয়ে তারা রাজা, রাজহত্যা সব কথাই ভুলে গেল।

সব কাক যে-যার ঘরে গেছে, তখন ঢোঁড়াকাক এসে রিদয়কে বললে—"তুমি জানো না আমার কি উপকার করেছ। এস আমার পিঠে চড়ো আমি তোমাকে এমন জায়গায় রেখে আসব যেখানে শেয়ালের বাবাও আর ধরতে পারবে না।"

এত হুটোপাটির পর রিদয়ের ঘুম পাচ্ছিল, সে কাকের পিঠে চড়ে ঢুলে-ঢুলে পড়তে লাগল! ঘুমের ঘোরে তার যেন মনে হল অন্ধকারে কাকের চেহারাটা গণেশের ইঁদুরের মতো হয়ে যাচ্ছে—কাক বগ হাঁস শেয়াল সব এক সঙ্গে তার মাথার ভিতরে ঘুরছে। এমন সময় আকাশ থেকে যেন বোধ হল চকার দল হাঁকলে—"কোথায়?"

"হেথায়" বলে যেমন রিদয় চেয়েচে অমনি দেখলে কোঁ করে দরজা খুলে গণেশের মতো মোটা পেট নিয়ে তার বাপ ঘরে ঢুকে বললেন—"কিছু ভাঙিসনি তো?"

রিদয় ভয়ে-ভয়ে একবার কুলুঙ্গিটার দিকে চেয়ে দেখলে যেখানকার গণেশ সেইখানেই রয়েছে—দুবার মাথা চুলকে

রিদয় এক দৌড়ে বাড়ির উঠোনে এসে দেখলে খোড়াহাঁস পুকুর পাড়ে একটা বুনো হাঁসের সঙ্গে ভাব করছে—আর একটা ঝোড়োকাক চালে বসে "কা-কা" করে ডাকছে—গোয়ালঘর থেকে কপলে গাই ডাকদিলে "ওমঃ" , ঠিক সেই সময় একটা গুগলী পুকুর ঘাট বেয়ে আস্তে-আস্তে জলে নেমে গেল।

রিদয় পুকুর পাড়ে হাঁ করে কি ভাবছে দেখে রিদয়ের মা কাছে এসে বললে—"কি হল তোর?"

রিদয় মাথা চুলকে বললে—"মা, আমি কি সত্যিই বড় হয়ে গেছি?" বলে আপনার মাথায় হাত বুলোতে লাগল!

সেই সময় ডালিমগাছে টুনটুনি পাখি বলে উঠল—"ওকি রিদয় হল কি!"

"মাথা আর মুণ্ডু হল!" বলে রিদয় পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে সাঁতার আরম্ভ করলে।

রিদয়ের মা চেঁচিয়ে বললে—"এত বড়টি হলি তবু তোর ছেলেমানষি গেল না। উঠে আয়, পাঠশালায় যাঃ।"

সমাপ্ত